মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৪৬।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে
নব-জীবন সংঘের উদ্যোগে
শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত

আগষ্ট—১৯৩৯

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র

চারণ-সর্দ্দার

শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে—

কাঞ্চন-কৌলিন্য দিয়ে করিনে বিচার
মানুষেরে, শ্রদ্ধা নাই পাণ্ডিত্যের স্তূপে,
কিবা মূল্য আছে বল বংশ-মর্য্যাদার ?
মানুষেরে দেখি মোরা মানুষেরই রূপে।
সুগঠিত দেহ আর নিঃশঙ্ক হৃদয়—
আমাদের এই দু'টী পরম রতন,
স্বাস্থ্যের প্রতীক তুমি, নাহি জানো ভয়,
তুমি তাই আমাদের সর্দ্দার-চারণ ॥

বিজয়

মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র

আমাদের জীবনকে শাসন করে আমাদের আদর্শ। যা তোমার আদর্শ তা হয়তো আমার আদর্শ নয়—যা আমার আদর্শ তা তোমার আদর্শ না-ও হ'তে পারে। কিন্তু জীবনের হাটে কারবার চালাতে হ'লে আদর্শ একটা-না-একটা চাই। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়—তার বিচার আমরা ক'রে থাকি আমাদের নিজের নিজের আদর্শের মাপকাঠির আশ্রয় নিয়ে।

এক-শ জনের মধ্যে নিরানব্বুই জন মানুষ নিজেদের সুবিধামত এক-একটা আদর্শ তৈরি ক'রে নেয়। সে আদর্শ খাঁটি হ'ল কি মেকী হ'ল, তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে না তারা। যে মত সমাজের আর দশ জন লোক পোষণ করে, তারই স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে

চলা তাদের স্বভাব। তাদের নিজেদের মত ব'লে কোনো বালাই নেই। সকলের পায়ের চিহ্নে চিহ্নিত যে পথ, সেই পথই হ'ল তাদের চলার পথ।

দমকা হাওয়ার মত সহসা আবির্ভূত হয় এক-এক জন নূতন ধরণের মানুষ। ধার-করা ছেঁদো কথা উচ্চারণ করে না তারা। তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় নূতন বাণী আর সেই বাণী শুনে চমকে ওঠে নরনারীর দল। যে আইডিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত, তারই জয়ধ্বজাকে প্রতিষ্ঠিত করে তারা দেশের বুকে; হাজার হাজার মানুষ যে মন্ত্র শোনে নি কোন দিন, সেই মন্ত্রকে তারা বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করে জাতির কর্ণকুহরে। মুগ্ধ জাতি সেই মন্ত্রের মধ্যে পায় নবজীবনের সন্ধান। জাতির হৃদয়-সিংহাসনে কেবল যে তারা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, তা নয়। যে-সব পুরাতন আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে জাতির চিত্তকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে—তাদের সিংহাসনচ্যুত করতে না পারলে নূতন আদর্শকে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য অভিনব আদর্শের স্রষ্টা যারা, তাদের মধ্যে কালাপাহাড়ের রূপও আমরা দেখতে পাই। গড়তে গেলেই ভাঙা চাই। এই যে নূতন ধরণের এক দল মানুষ—যারা ইতিহাসে দেখা দেয় নূতন আদর্শের স্রষ্টারূপে, এঁদেরই আমরা ব'লে থাকি প্রতিভবান (genius)। ডক্টর ষ্টেকেল প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

What else do geniuses, the path-finders of mankind, accomplish but to disseminate a hitherto neglected or even unknown idea and cause it to be generally accepted or to cause ideas that have hitherto stood high in the world's estimation to topple from their thrones? *

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ হ'ল, প্রতিভার কাজ হচ্ছে যে-আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন তাকে জনসাধারণের চিত্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা, অথবা যে-আদর্শ অনেক কাল ধ'রে মানুষের কাছ থেকে পূজা পেয়ে এসেছে তাকে জনসাধারণের হৃদয়-সিংহাসন থেকে অনাদরের ধূলায় ফেলে দেওয়া।

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্থানটি কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে বারে বারে আমার মনে জেগেছে ডক্টর ষ্টেকেলের এই কথাগুলি। অনন্যসাধারণ প্রতিভা বলতে যা বুঝায়, বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল তাই। সেই প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নবজীবনের অরুণালোকের মধ্যে আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছেন তিনিই। অমর হবার মন্ত্র দিয়েছেন আমাদের কানে, দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ যাকে অবলম্বন ক'রে মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষ আজ স্বরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণের অনেকখানি নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে। ঋষি অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের গগনস্পর্শী প্রতিভার বেদীমূলে অর্ঘ্যদান করতে গিয়ে লিখেছেন,

* "The Depths of the Soul" by Dr. William Stekel, P. 162.

Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru.

বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এত বড় সত্য এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আর কেউ বোধ হয় উচ্চারণ করেন নি।

আগেই তো বলেছি, প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে সেই আইডিয়ার জয়ধ্বজাকে জনসাধারণের হৃদয়-কন্দরে প্রতিষ্ঠিত করা যে-আইডিয়া আর সকলের কাছে ছিল হয় অজ্ঞাত নয় অজানা। প্রতিভার কাজ সেই অগ্নিগর্ভ বাণী শোনানো যা সবাইকে চমকে দেয় তার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে। যারা এই বাণী শোনাতে পারে তারাই ইতিহাসে আনে যুগান্তর, তাদেরই উচ্চারিত মহামন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে জাতি লাভ করে নবজন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারত-ভাগ্যবিধাতা পাঠিয়েছিলেন দেশাত্মবোধের জয়ধ্বনি করবার জন্য। বন্দে মাতরম্—এই মহামন্ত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধেরই জয়গান। আমাদের চেতনায় দেশাত্মবোধের অনুভূতি কোন দিনই জীবন্ত ছিল না। সে-অনুভূতি জীবন্ত থাকলে আমাদের ললাটে আজ আঁকা থাকত না দাসত্বের কলঙ্কতিলক। আমাদের চিত্ত পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে—কৌলীন্যের মর্য্যাদাকে আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে এসেছি। আমরা কার সন্তান, কোন্ মেল—তারই পরিচয় দিয়েছি সগর্ব্বে। হায়, 'আমি ভারতবাসী' —কেবল এই গর্ব্বে কোন দিন ফুলে ওঠেনি আমাদের

বুক। আমরা তো দেশের সঙ্গে কোন দিন অনুভব করি নি আমাদের আত্মীয়তাকে। স্ত্রীপুত্রের প্রতি অত্যধিক মমতা আমাদের সহানুভূতিকে কখনও ব্যাপ্ত হ'তে দেয় নি গৃহ-প্রাকারের বাহিরে বৃহত্তর দেশের মধ্যে। বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখেছেন,

এজন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙালীর এই কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

আমরা ঈশ্বরকে ভালবেসে গৃহত্যাগী হয়েছি, বসুধাকেও কুটুম্ব ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি—কেবল পারি নি কোন দিন স্বদেশকে আপনার ব'লে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে। আমাদের বিশ্বপ্রেমের মধ্যে দেশপ্রীতির ছিল না কোন ঠাঁই। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আর এক জায়গায় বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

আমাদের এই দেশাত্মবোধের অভাবের কথা বঙ্কিম 'ভারতকলঙ্ক' নামক বিখ্যাত রচনার মধ্যেও ব্যক্ত করেছেন। সেখানে আছে,

যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের চিন্তা-ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন জাতি-প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আর সেই আইডিয়ার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন দিক্ থেকে দিগন্তরে। ইংরেজ ক্লাইব, ইংরেজ হেষ্টিংস, ইংরেজ ডায়ার এবং ইংরেজ ও'ডায়ার আমাদের যে ক্ষতি করেছে তা অপরিমেয়। কিন্তু ইংরেজ আমাদের কি কেবল ক্ষতিই করেছে? ইংরেজ শেলী আর ইংরেজ মিল্টন, ইংরেজ মিল আর ইংরেজ ডারউইন, ইংরেজ স্পেন্সার আর ইংরেজ রাস্কিন প'ড়ে আমরা কি কিছুই শিখি নি? ইংরেজী সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রেই কি স্বদেশভক্তির আইডিয়া আমাদের দেশে বাসা বাঁধল না? ইংরেজের বই প'ড়ে তো আমরা জানলাম ম্যাট্‌সিনীর অগ্নিগর্ভ বাণীকে। বার্ক প'ড়ে আমরা শিখলাম, জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে কর বসানো অত্যাচার। Taxation without representation is nothing but tyranny. লেকীর ইতিহাস আমাদের পরিচিত ক'রে দিলে আমেরিকার বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে। কার্লাইল প'ড়ে আমরা জানলাম ফরাসী জাতির বাঁধন-ছেঁড়ার ইতিহাসকে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখনী আমাদের কাছে বহন ক'রে আনলে ডচ্-বিপ্লবের মর্ম্মবাণী। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা জানলাম রুসোকে আর ইউরোপের সাম্যবাদিগণের

চিন্তাধারাকে। টলষ্টয় আর থোরো আর রাস্‌কিনকে বাদ দিয়ে গান্ধীর কথা আমরা ভাবতে পারি নে। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করেছে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে। ইংরেজের কাছে আমরা সত্যসত্যই ঋণী। সে ঋণকে অস্বীকার করলে আমরা কৃতঘ্নতার অপরাধে অপরাধী হব। পশ্চিমের কাছ থেকে বঙ্কিম পেলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার আইডিয়া। সেই আইডিয়াকে তিনি ভাষা দিলেন বন্দে মাতরমের অমর সঙ্গীতের মধ্যে, আর এই মহাসঙ্গীতই সৃষ্টি করেছে অরবিন্দের আর তিলকের, গান্ধীর আর জওআহরলালের মুক্তি-পাগল বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে। স্বাধীনতার এবং সাম্যের আইডিয়ার জন্য বঙ্কিম পশ্চিমের কাছে কতখানি যে ঋণী—তাঁর সাম্য প্রবন্ধটি পড়লেই সে কথা পরিষ্কার ক'রে বোঝা যায়। বঙ্কিমের চিত্তের উপরে পাশ্চাত্য যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—তাঁর লেখার মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। তবে পাশ্চাত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে যারা প্রাচ্যের সাধনাকে অস্বীকার করে—সেই পরানুকরণপ্রিয় লোকেরা কোন দিনই তাঁকে দলে টানতে পারে নি। এই জন্যই দেখতে পাই, তাঁর দেশপ্রীতি ছিল ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ থেকে স্বতন্ত্র, যাকে বলে হিন্দু আদর্শ তারই ছাঁচে ঢালা। মানবসমষ্টিকে বড় করতে গিয়ে স্বদেশের দাবিকে যেমন তিনি অস্বীকার করেন নি, স্বদেশের দাবিকে বড় করতে

গিয়ে জাগতিক প্রীতির দাবিকেও তেমনি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি—ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন ক'রলে বঙ্কিমের দেশপ্রীতি হ'ত হিটলারের আর মুসোলিনীর দেশপ্রীতির মতই উৎকট। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখেছেন,

—ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।

জাগতিক প্রীতির সঙ্গে দেশপ্রীতির এই যে সামঞ্জস্য—এই সামঞ্জস্যই তো বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি এসেছিলেন পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমকে মেলাতে—পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রাচ্যের জাগতিক প্রীতির সামঞ্জস্য ঘটাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার এই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য ক'রেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

—বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বপশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।—'সমাজ'।

যে-কথা বলছিলাম। বঙ্কিম ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আর জাতি-প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আর সেই আইডিয়াকে সাহিত্যে বাণী-মূর্ত্তি দিলেন আনন্দমঠে আর দেবীচৌধুরাণীতে, কৃষ্ণ-চরিত্রে আর ধর্ম্মতত্ত্বে। Ideas rule the world. সংসারে আইডিয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত—একথা যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে দেবীচৌধুরাণী আর আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র আর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করেছে তার কানে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আর শিভ্যাল্‌রির মহামন্ত্র শুনিয়ে। বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যকে ছোট ক'রে দেখবার মত ঔদ্ধত্য অথবা নির্ব্বুদ্ধিতা আমার নেই। কৃষ্ণকান্তের উইল অথবা দুর্গেশনন্দিনীও বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম দুটি রত্ন। আমি শুধু বলতে চাই বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুণ্ডলার বঙ্কিম আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে সৃষ্টি করলেও নব্যভারতের স্রষ্টার যে গৌরব—সেই গৌরবের দাবি করবে আনন্দমঠের আর কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বঙ্কিম। এখানে আর একবার অরবিন্দের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি,

What is it for which we worship the name of Bunkim to-day? What was his message to us or what the vision which he saw and has helped us to see? He was a great poet, a master of beautiful language and a creator of fair and gracious dream-figures in the world of imagination;

but it is not as a poet, stylist or novelist that Bengal does honour to him to-day. It is probable that the literary critique of the future will reckon "Kapal Kundala," "Bisha-briksha," and "Krishna Kanta's Will" as his artistic masterpieces, and speak with qualified praise of "Debi Chaudhurani," "Ananda Math," "Krishna Charit" or "Dharmatattwa." Yet it is the Bunkim of these latter works and not the Bunkim of the great creative master-pieces who will rank among the Makers of Modern India. The earlier Bunkim was only a poet and stylist—the later Bunkim was a seer and nation-builder.'

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ হ'ল, আজ আমরা বঙ্কিমের স্মৃতিপূজায় ব্রতী হয়েছি কেন? কোন্ বার্ত্তা তিনি বহন ক'রে এনেছিলেন আমাদের প্রাণের দ্বারে? কোন্ মূর্ত্তিকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন আমাদের নয়নসম্মুখে? অতুলনীয় ছিল তাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য—আমাদের কল্পনার জগৎকে তিনি ভরিয়ে রেখেছেন স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে। কিন্তু বাঙালী যাঁর স্মৃতিপূজায় আজ ব্রতী হয়েছে এমন উৎসাহের সঙ্গে তিনি ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নন্। ভবিষ্যতের সাহিত্য-সমালোচক হয়তো তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ অথবা কৃষ্ণকান্তের উইলকে উচ্চতর আসন প্রদান করবে—কিন্তু আসলে দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের কাছে থেকে

পূজা পাবে নব্যভারতবর্ষের স্রষ্টা ব'লে। প্রথম যুগের বঙ্কিম কবি এবং ভাষার যাদুকর—পরবর্ত্তী যুগের বঙ্কিম ঋষি এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্কিম যদি শুধু কপালকুণ্ডলা অথবা বিষবৃক্ষ লিখে যেতেন তা হ'লেও তিনি বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজসমারোহে বিরাজ করতেন, কিন্তু তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব এমন সার্ব্বজনীন রূপ গ্রহণ করত না। তাঁকে নিয়ে আজ যে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বাংলার বাহিরে ও ভিতরে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে, তার কারণ আমাদের দেশাত্মবোধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং সেই জাগ্রত চৈতন্যের আলোকে আমরা তাঁকে আজ চিনতে পেরেছি পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রফেট্‌ ব'লে। দেশপ্রীতি তাঁর কাছে দেখা দেয়নি শুষ্ক কর্ত্তব্যের রূপ ধ'রে। স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লেখা আছে,

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আর এক জায়গায় আছে,

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে,

পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হ'লে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার পথ কি প্রশস্ত হ'ত না? আমাদের পরাধীনতা কি পৃথিবীর কল্যাণের পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে নেই? সমস্ত কথা ভাল ক'রে ভেবে চিন্তেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম ব'লে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। অরবিন্দ বলেছেন,

The religion of patriotism—This is the master idea of Bunkim's writings.

ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে জীবনের পরমধর্ম্ম—সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে এই বাণীপ্রচারে বঙ্কিম আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন কেন? কারণ বঙ্কিম সমস্ত চিত্ত দিয়ে ভালবেসেছিলেন তাঁর স্বদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত, অর্দ্ধনগ্ন, মেরুদণ্ডহীন নরনারীকে। বাস্তবের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে চিত্ত তাঁর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল।

আজি দেশের সর্ব্বত্র শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন, হায় মা!

এই ব'লে আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী যেখানে দরদরধারায় অশ্রুমোচন করছেন—সেখানে সেই রোদনধ্বনির মধ্যে আমরা কি শুনতে পাই নে বঙ্কিমেরই অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর?

সংসারে অনেক মানুষ আছে যারা বাস্তবের ডাকে সাড়া দিতে ভয় পায়। কঠিন সত্যের দিকে পিছন ফিরিয়ে তাদের ভীরুচিত্ত আশ্রয় নেয় রং-বেরঙের স্বপ্নের মধ্যে। আর্টের কল্পরাজ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা ভুলবার চেষ্টা করে বাস্তবের কঠিনতাকে, সুন্দরের পক্ষতলে বাসা নিয়ে সত্যের দাবিকে করে অস্বীকার। শ্মশানের কঙ্কালরাশির মধ্যে কল্পনার প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটে বেড়ানো তাদের স্বভাব। বঙ্কিমের সবল চিত্ত কিন্তু আর্টের দোহাই দিয়ে বাস্তবের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে নি। যে-বাস্তব তার দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা ও ভীরুতা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিল তাকে তিনি কিছুতেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না। বর্ত্তমানের কদর্য্যতাকে আড়াল ক'রে তাঁর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভাবী ভারতবর্ষের অপরূপ মূর্ত্তিখানি। সেই ভারতবর্ষ শস্যের প্রাচুর্য্যে সুশ্যামল, জ্ঞানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, শৌর্য্যের শিখরদেশে অখণ্ড গরিমায় সমাসীন। ভবিষ্যতের এই নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্নে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। সেই তন্ময়তা থেকেই সৃষ্ট হ'ল বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র। ধ্যানের এই নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্য, বঙ্কিম সাহিত্যকে ক'রলেন আশ্রয়।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখলেই হ'ল না। স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে রূপ দেবার জন্য সাধনা চাই। সেই সাধনার পথ কণ্টকে সমাকীর্ণ। বঙ্কিম তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন—দীনামলিনা

জন্মভূমিকে রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করবার পথে সবচেয়ে প্রবল বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক পরাধীনতা। পরস্বলোলুপ অপর জাতির অধিকারভুক্ত হওয়ায় তাঁর স্বদেশের দুর্গতির অন্ত নেই। তিনি আরও দেখলেন এই অন্তহীন দুর্গতিকে দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জন্মভূমিকে অপর জাতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু আত্মকলহে নিমগ্ন যে জাতি শতধাবিচ্ছিন্ন, যাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের একান্ত অভাব—সে দুর্ব্বল জাতি মুক্ত হবে কেমন ক'রে? যারা পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, তাদের শৃঙ্খল ঘোচাবে কে? যাদের চেতনা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কেবল দম্পতিপ্রীতির আর অপত্যপ্রীতির ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডীর মধ্যে, তাদের শৃঙ্খলমুক্ত করা দেবাদিদেব মহাদেবেরও অসাধ্য। চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গৃহ-প্রাকারের বাহিরে অগণিত নরনারীর মধ্যে—বিরাট দেশের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করা চাই। তবে তো মুক্ত হবে কারাগারের দ্বার। আমি দেশের—দেশ আমার—দেশপ্রীতি আমার সকলের চেয়ে বড় ধর্ম্ম—এই বোধ জাগলে তবে তো মানুষ স্বদেশরক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে দাঁড়াবে। যেখানে এই বোধেরই অভাব সেখানে পরাধীনতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ আসবে কেন? বঙ্কিম দেখলেন সকলের চিত্তে দেশাত্ম-বোধকে জাগাতে না পারলে স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা ভিন্ন নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভব

নয়। তিনি তাই পেট্রিয়টিজ্‌মের উপরে জোর দিলেন সকলের চেয়ে বেশী আর পেট্রিয়টিজ্‌মের যে ব্যাখ্যা তিনি দিলেন তার মধ্যে রইল না কোন অস্পষ্টতার ছায়া। অত্যন্ত সোজা ভাষায় তিনি বললেন,

ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice ; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism ; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন।

এর উপরে টীকা অনাবশ্যক।

স্বদেশকে পরস্বলোলুপ জাতির গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হ'লে কেবল দেশাত্মবোধের অনুভূতির প্রাবল্য যথেষ্ট নয়, পৌরুষেরও প্রয়োজন। উৎপীড়কের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করবার মত সাহস নেই যেখানে, সেখানে স্বাধীনতার আবির্ভাব অসম্ভব। তাই বঙ্কিম পৌরুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জাতির হৃদয়ে। 'জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো'—এই কুকুর-জাতীয় পলিটিক্স-চর্চ্চার পথে স্বাধীনতা যে কোন দিনই আস্‌বে না—একথা বঙ্কিম ভাল ক'রেই জানতেন। রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর-জাতীয় মেরুদণ্ডহীনদের ঘ্যানঘ্যানানি বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার করত তাঁর ক্ষাত্রতেজে পরিপূর্ণ গর্ব্বিত অন্তরে। স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে হ'লে শক্তিমানের বৃষ-জাতীয় পলিটিক্স ছাড়া যে উপায় নেই—এ সত্য তিনিই আমাদের কর্ণে প্রথম ঘোষণা করলেন। অরবিন্দ বঙ্কিমের এই দিকটার সম্পর্কে লিখেছেন,

He, first of our great publicists, understood the hollowness and inutility of the methods of political agitation—which prevailed in his time and exposed it with merciless satire in his 'Lokarahasya' and 'Kamala Kanta's Daftar.' But he was not satisfied merely with destructive criticism,—he had positive vision of what was needed for the salvation of the country. He saw that force from above must be met by a mightier reacting force from below,—the strength of repression by an insurgent national strength. He bade us leave the canine method of agitation for the leonine.

কিন্তু যে-দেশে ভগবান হচ্ছেন শিখিপুচ্ছধারী, বংশীবাদক বনমালী এবং আদর্শ-বৈষ্ণব বলতে বোঝায় তৃণাদপি সুনীচ এবং তরোরিব সহিষ্ণু মেরুদণ্ডহীন জীব, সেই ধর্ম্মশাসিত দেশে অন্যায়কে আঘাত করবার জন্য মানুষ উদ্যত হবে কেন? এদেশে বিষ্ণুকে আঁকা হয়েছে কেবল প্রেমময় রূপে। তিনি প্রেমের দেবতা, মধুর থেকেও মধুরতর তাঁর মূর্ত্তি। তিনি কান্ত, কোমল, করুণায় ঢলঢল। তিনি শুধু সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন।

বঙ্কিম দেখলেন—বৈষ্ণবের যে আদর্শ গৌড়জনের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে—তাকে সর্ব্বাগ্রে ভাঙতে হবে। তৈরি করতে হবে বৈষ্ণবের নূতন আদর্শ। এই নূতন বৈষ্ণবের দল তৃণের মত সুনীচ এবং তরুর মত সহিষ্ণু হবে না। তারা হবে পদাহত ভুজঙ্গমের মতই অশান্ত। ধৈর্য্য তাদের আদর্শ

হবে না, তাদের আদর্শ হবে শৌর্য্য। পরাধীন দেশে ধৈর্য্য মানুষের গুণ নয়, কলঙ্ক। ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে বলছেন,

দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না?

বঙ্কিম চাইলেন দেশের অগণ্য শৃঙ্খলিত মহেন্দ্র সিংহের অবিচলিত চিত্তকে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনায় বিচলিত ক'রে তুলতে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এক পক্ষের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য এবং আর এক পক্ষের 'নিরাপদ নীরব নম্রতা' মৃত্যুর শাসনকে রেখেছে অক্ষুণ্ণ। এই নম্রতার আদর্শকে দূর করতে না পারলে অন্যায়ের স্পর্দ্ধা কোন দিনই চূর্ণ হবে না।

যে আদর্শ কেবলই আমাদের শান্ত আর নত হ'তে শেখায়, তাকে ভাঙবার জন্যই বঙ্কিম আনন্দমঠের সন্তানগণকে বৈষ্ণব ক'রে তৈরি করলেন। তিনি তাদের কাপালিক ক'রেও সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সঙ্গে শক্তির যে কোন অসামঞ্জস্য নেই—এই কথা প্রচার করবার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সন্তানের আদর্শ হ'ল তাই শৌর্য্য, নম্রতা নয়। সন্তানের উপাস্য বিষ্ণুর হাতে বাঁকা বাঁশী নয়, সুদর্শনচক্র। মহেন্দ্র সিংহ যখন বললেন, "সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।"—তখন সত্যানন্দের সতেজ কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ভারতবর্ষের কানে বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করলেন,

সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।

ধৈর্য্য এবং নম্রতার আদর্শকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে শক্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেমন তিনি আনন্দমঠের সন্তানগণকে বৈষ্ণব ক'রে সৃষ্টি করলেন, তেমনি তিনি তরুণ ভারতবর্ষের সম্মুখে রাখলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। চৈতন্য, বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের প্রচারিত নম্রতার আদর্শের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি আদর্শ-মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই কৃষ্ণকে যিনি অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন না দুর্য্যোধনের অন্যায়কে নীরবে সহ্য করতে। তাকে তিনি অনুপ্রাণিত করলেন গাণ্ডীব ধ'রে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে, মহাভারতের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কণ্টক যারা তাদের নির্ম্মমভাবে অপসারিত করতে। মহাভারতের কৃষ্ণ কেবল সৃষ্টি আর পালন করেন না—তিনি ধ্বংসও করেন—কারণ সৃষ্টি করতে হ'লে ধ্বংস না ক'রে উপায় নেই। তরুর মত সহিষ্ণু এবং তৃণের মত নম্র হ'য়ে জীবনযাপন করাকে বঙ্কিম ধর্ম্ম ব'লে একেবারেই মনে করতেন না। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেবার খ্রীষ্টীয় আদর্শকে নীট্‌শে যেমন আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি, বঙ্কিমও তেমনি তাকে আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি। খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে হিন্দু-আদর্শকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠ ব'লে আর এই হিন্দু-আদর্শ দুষ্টের দমনকে

ধর্ম্ম ব'লে এবং অন্যায়কে সহ্য করাকে অধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করেছে। ধর্ম্ম বলতে এবং অধর্ম্ম বলতে বঙ্কিম ঠিক কি বুঝতেন, কৃষ্ণচরিত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি তীরের মত সরল ভাষায় বলছেন,

> যে ধর্ম্ম রক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে-ই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম।

জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা—কৃষ্ণের এই সব কাজের মধ্যে অন্যায়কে বাধা দেবার আদর্শই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই জন্যই বঙ্কিম পরাধীন ভারতবর্ষের সম্মুখে খ্রীষ্টকে, বুদ্ধকে অথবা চৈতন্যকে আদর্শ-মনুষ্যরূপে উপস্থিত করলেন না, তিনি উপস্থিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। সাম্রাজ্যবাদের নাগ-পাশকে ছিন্ন করবার জন্য পৌরুষের আদর্শের প্রয়োজন ছিল—আর কৃষ্ণ সেই পৌরুষেরই প্রতীক। বড় দুঃখেই তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখেছিলেন,

> জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।

বঙ্কিম বুঝেছিলেন, গীতার কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েই সর্ব্বনাশকে আমরা ডেকে এনেছি। অর্জ্জুনকে যিনি ক্ষত্রিয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের সেই পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণের

আদর্শকে ক্ষুণ্ণ ক'রেই ভারতবর্ষ হারিয়েছে তার পৌরুষ এবং পৌরুষকে হারিয়েই সে বঞ্চিত হয়েছে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ্ থেকে। একথা বুঝেছিলেন ব'লেই জয়দেব গোঁসাইকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি। যারা কৃষ্ণের হাত থেকে সুদর্শনচক্র আর পাঞ্চজন্য কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে মোহন বাঁশী, তাঁকে কপিধ্বজ রথের সারথির আসন থেকে টেনে নিয়ে এসে কদমের ডালে বসিয়ে চুরি করিয়েছে গোপীগণের বস্ত্র, তারা যে কৃষ্ণচরিত্রকে অবনত ক'রে ভারত-বর্ষের অধঃপতন ঘটিয়েছে—এ-কথা বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন মনে-প্রাণে। তাই তো তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখেছেন,—

যেদিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি।

'ধর্ম্মতত্ত্বে' আছে—

তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না।

বঙ্কিম, তোমার চরণমূলে আমার অজস্র প্রণতি। এই তরুণ মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষের প্রতিটি শিরায় তোমার রুদ্রবীণার ঝঙ্কার। তুমি আমাদের যে সম্পদ্ দান করেছ, তার পরিমাণ করা যায় না। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। তুমি আমাদের কানে শুনিয়েছ বন্দে মাতরমের মৃত্যুহীন মন্ত্র আর সেই অমর মন্ত্রের মধ্যে আমরা অকস্মাৎ খুঁজে পেলাম আমাদের ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। তুমি চেয়েছিলে ক্লীবের জাতিকে

মৃত্যুভয়হীন বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করতে এবং সেইজন্য কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ ক'রে ধরলে দেশের সামনে—তার কানে শোনালে ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মকথা। তুমি আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছ স্বাধীন ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। সে প্রতিমা আমাদের হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুক্ত ভারতের অনিন্দ্যসুন্দর রূপকে যারা একবার প্রত্যক্ষ করেছে কল্পনার নেত্রে, তাদের বেঁধে রাখবে কোন্ বিজেতার শৃঙ্খল ?

A great nation which has that vision can never again be placed under the feet of the conqueror.

বঙ্কিম, তুমি আমাদের মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁধন-ছেঁড়ার যে উন্মাদনা জাগিয়েছ জাতির অন্তরে, সেই উন্মাদনাই আজ সমস্ত বাধাবিঘ্নের মধ্য নিয়ে মুক্তির মন্দির পানে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। তোমাকে আবার প্রণাম। বন্দে মাতরম্।*

* কাশী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে পঠিত অভিভাষণ।

যুগস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র

যে জাতি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে হ'লে মন্ত্রের সোনার কাঠির প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে যতবার যুগান্তর এসেছে ততবারই আমরা দেখেছি নবযুগের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছে মন্ত্রের যাদু। এক একজন মহাশক্তিমান পুরুষের কম্বুকণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বিধাতা ঘুমন্ত জাতির কর্ণে শুনিয়েছেন অগ্নি-বচন আর সেই অগ্নি-বচন সুপ্তিমগ্ন জাতিকে জাগরিত ক'রেছে নবজীবনের স্বর্গলোকে। এই সব শক্তিমান পুরুষকেই আমরা ব'লে থাকি ঋষি। ঋষির সঙ্গে সাধুর তফাৎ আছে। সাধুর জীবনের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে তাঁর চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল মহিমার মধ্যে। ঋষির জীবন স্বর্গীয় পুণ্যাচ্ছটায় দীপ্ত নাও হ'তে পারে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা আদর্শ-সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আমরা নাও দেখতে পারি। তিনি আমাদের কাছে মহৎ যা তিনি ছিলেন তার জন্য নয়, যা তিনি ব্যক্ত করেছেন তারই জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দান করেছেন মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম"—সেই মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র যার যাদু সৃষ্টি করেছে আজিকার এই নতুন ভারতবর্ষকে। অরবিন্দের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি,

Among the Rishis of the later age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving mantra which is creating a new India, the mantra Bande mataram.

এর বাঙলা অনুবাদ—

"অবশেষে আমরা উপলব্ধি করেছি, যে মানুষটি বন্দে মাতরমের সঞ্জীবনী মহামন্ত্র আমাদের দান করেছেন—তাঁকে পরবর্ত্তী যুগের ঋষি-গণের অন্যতম ব'লে স্বীকার করতেই হবে। সেই মন্ত্রই নব্যভারতকে আজ সৃষ্টি করছে।"

অধঃপতিত কোনো জাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে হ'লে তার সামনে ধরা চাই নতুন আইডিয়াল। সেই আইডিয়াল নেই যেখানে, সেখানে নবসৃষ্টি অসম্ভব। বঙ্কিম আমাদের সামনে ধরলেন আদর্শ—এমন একটা আদর্শ যার সঙ্গে আমাদের ছিলো না কোনা পরিচয়। তিনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখালেন—নতুন জন্মভূমির জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন। কেমন সেই জন্মভূমি? বঙ্কিমের কাছে তাঁর কল্পনার স্বদেশ প্রতিভাত হয়েছিল দশভুজার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে। আনন্দমঠে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত দশভুজা প্রতিমার সম্মুখে প্রণত ব্রহ্মচারী মহেন্দ্র সিংহকে বল্‌ছেন,—

"এই মা যা হইবেন। দশভুজা দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত।"

কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার দুর্গোৎসব' নামক প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম পুনরায় তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন ভাবী জন্মভূমির অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিকে।

"এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।·········এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

নতুন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্য স্বদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনশ্চক্ষের সম্মুখে জন্মভূমির এমনি একটা প্রচণ্ড-মনোহর মূর্ত্তিকে উদ্ঘাটিত করবার একান্তই প্রয়োজন ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাগ্যবান ঋষি যাঁর চক্ষুদুটিকে বিধাতা সর্ব্ব-প্রথম উন্মীলিত করলেন মাতৃভূমির গৌরবোজ্জ্বল ভাবী রূপকে অবলোকন করবার জন্য। সেই রূপের ঐশ্বর্য্য দেখে বঙ্কিম আনন্দের আতিশয্যে কাঁদলেন। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে জন্মভূমির ভাবী মূর্ত্তি দেখিয়ে 'দশভুজা' বল্‌তে বল্‌তে যেখানে গদগদ কণ্ঠে কেঁদেছেন সেখানে সেই কান্না তো বঙ্কিমেরই কান্না। বঙ্কিমের ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে স্বদেশের যে ছবি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, তা দেখে কাঁদবারই কথা!

হৃতসর্ব্বস্ব দরিদ্র দেশের যে কঙ্কালমালিনী কালীমূর্ত্তি দেখে বঙ্কিমের হৃদয় একদিন 'হায় মা!' ব'লে কেঁদে উঠেছিলো সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমার মধ্যে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশ সম্পদের প্রাচুর্য্যে নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়ে হাসছে। দেশব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিলুপ্ত ক'রে দীপ্তি পাচ্ছে জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অজস্র দানে সভ্যতার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেখানে ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র ছিলো, সেখানে শোভা পাচ্ছে বীরের হাতে [illegible]র খড়্গ। বঙ্কিমের ধ্যানের ভারতবর্ষ সম্পদের প্রাচুর্য্যে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানের শুভ্র দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময়, শৌর্য্যের বিপুলতায় অপরাজেয়। স্বদেশের এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শকে একটি মৃত্যুহীন সঙ্গীতের মধ্যে রূপ দিলেন বঙ্কিম। সঙ্গীতটি যখন রচিত হয়েছিলো তখন কেউ বুঝতে পারেনি তার বিরাট অভ্রভেদী মহিমাকে। তার পর এলো আর এক দিন। দীর্ঘকালের মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠে জাতি সেদিন সন্ধান করছিলো সেই সত্যের যা তাকে দান করবে নবজীবনের গরিমা। সহসা কার কণ্ঠ থেকে এক অপরূপ মুহূর্ত্তে উৎসারিত হোলো বন্দেমাতরম্ মন্ত্র আর সেই মন্ত্রের পরশমণির ছোঁয়া লেগে একই দিনে একটা বিরাট জাতি দীক্ষিত হোলো দেশাত্মবোধের নবীন ধর্ম্মে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর যে কখনো ঘটেনি, তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে

ছড়িয়ে পড়েছিল এক অদ্ভুত আর অভিনব গানের আগুন। ইতিহাসে এই গান মার্সাইলে (Marseillaise) নামে খ্যাতি লাভ করেছে। কণ্ঠে নিয়ে মার্সাইলের রক্ত-গরম-করা সুর আর হাতে নিয়ে সুতীক্ষ্ণ বেয়নেট—মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নূতন ফরাসীজাতি সেদিন বিদেশী রাজন্যবর্গের হীন আক্রমণকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছিলো। ফরাসীদেশের এই মহাসঙ্গীতকে লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ সাহিত্যিক গার্ডিনার (A. G. Gardiner) লিখেছেন, And the "Marseillaise' sang Europe free. ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি এবং সত্যের অনুমাত্র অপলাপ না ক'রে আমরাও অনায়াসে অদূরভবিষ্যতে বলবো, And the "Bandemataram" sang India free.

এই যে মহামন্ত্র বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ ক'রে বঙ্কিম যে দিন দেশের সম্মুখে ধরলেন একটা বিরাট আদর্শ—সেই দিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হয়েছে স্বাধীনতার পথে আমাদের জয়যাত্রা। সে যাত্রা আজও থেমে যায়নি—থাম্‌তে পারে না যতদিন পর্য্যন্ত আমরা উপনীত না হই মুক্তির মন্দির-প্রাঙ্গণে। একটা জাত যখন তার আদর্শকে একবার পেয়ে গেছে তখন আর ভাবনা কিসের? আর কত বড় একটা আদর্শ! কোটি কোটি জীবন্ত কঙ্কালে পরিপূর্ণ মহাশ্মশানের বুকের উপরে পত্তন করতে হবে নূতন ভারতবর্ষের—যেখানে দারিদ্র্য নেই, অজ্ঞতা নেই, দুর্ব্বলতা নেই! জন্মভূমিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার এই মহাস্বপ্ন যখন থেকে অধিকার ক'রে বসলো জাতির

হৃদয়কে তখন থেকেই তো তার নূতন ইতিহাস লেখা সুরু হ'য়ে গেলো। বঙ্কিম তাঁর মহাসঙ্গীত দিয়ে ভারতবর্ষের যে নতুন ইতিহাস রচনা সুরু ক'রে দিলেন—আজিকার মুক্তি সাধনার মধ্যে দেখতে পাই সেই ইতিহাসেরই প্রবহমান ধারাকে। বঙ্কিম সত্যসত্যই নতুন ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক গুরু।

মানুষের ইতিহাসে যারা বারে বারে যুগান্তর এনেছে, তাদের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। তারা একদিকে যেমন নিজেদের তৈরী আদর্শের উপরে অত্যন্ত বেশী জোর দিয়েছে—তেমনি আর একদিকে পুরোণো আদর্শগুলিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। বঙ্কিমের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাইনে। দেশ-প্রীতির আদর্শ আমাদের দেশের জনসাধারণের মনের উপরে কখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বঙ্কিম এই নতুন আদর্শকে সৃষ্টি করলেন। তিনি লিখলেন,—

"আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজন-রক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে প্রীতি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশ-প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাকে তিনি অভিহিত করলেন "ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম" ব'লে।

কিন্তু নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হচ্ছে সেই সব আদর্শ যারা অনেক কাল ধরে

আছে মনের সিংহাসনকে। যুগস্রষ্টা genius এসে যখন নূতন মন্ত্র প্রচার করেন তখন তাঁকে সম্মুখীন হ'তে হয় একটা দুর্ব্বার বাধার সঙ্গে। পুরাতন আদর্শগুলি কিছুতেই নূতনকে ঠাঁই দিতে চায় না। তখন নবীনে আর প্রাচীনে বাধে দ্বন্দ্ব। আদর্শের সঙ্গে আদর্শের এই সংঘাত প্রত্যেক যুগসন্ধিক্ষণকে বেদনায় ফেনিল ক'রে তোলে। এই বেদনার ফেনিলতার মধ্যেই নবযুগ আবির্ভূত হয়। বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলো, দেশপ্রীতির আদর্শকে সর্ব্বগ্রাসী আদর্শ ক'রে তুলতে না পারলে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে না। তাই তিনি দেশের জন্য জীবনদানকে পর্য্যন্ত বললেন তুচ্ছ। তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে দাবী করলেন ভক্তি। জন্মভূমির বেদীমূলে কেবল জীবন নয়, আপনাকে দিতে হবে বলি। জীবন সবাই দিতে পারে। মাতৃভূমির পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে পারে, এমন লোকই দুর্ল্লভ। এই যে ভক্তির আদর্শ—এই আইডিয়ালকে সর্ব্বজয়ী করবার জন্য বঙ্কিম পুরাতন আদর্শ-গুলিকে করলেন জোরের সঙ্গে আঘাত। দেশবাসীর অন্তরকে আর সব আদর্শের শাসন থেকে মুক্তি দিতে না পারলে সেখানে তো প্রতিষ্ঠিত করা যাবেনা দেশপ্রীতির আদর্শকে।

বঙ্কিম হাতে তুলে নিলেন যোদ্ধার হাতিয়ার আর প্রথমেই আঘাত করলেন স্বজনপ্রীতির আদর্শকে। বঙ্কিম নিজে বাঙালী ছিলেন ; এই জন্যই জানতেন, বাঙালীর সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা

হ'চ্ছে তার অপত্যপ্রীতির আর দম্পতিপ্রীতির আতিশয্য। ঘরের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বাঙালীর চেতনাকে পরিব্যাপ্ত হ'তে দেয় না বহুজনের মধ্যে। স্বজনপ্রীতির এই প্রাচুর্য্যকে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ব'লে নিন্দা তো আমরা করিই নি, বরং একে সমর্থন ক'রে এসেছি কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে। ঘর-মুখো বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মুখোস-পরা এই স্বার্থপরতাকে বঙ্কিম ক্ষমা করলেন না। ভবানন্দের কণ্ঠকে অবলম্বন ক'রে তিনি বল্‌লেন,—

"আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, ভাই নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—"

সত্যানন্দের কাছে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে মহেন্দ্র সিংহ যেখানে প্রশ্ন করেছেন,—

"যে স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোনো গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?"

সেখানে সত্যানন্দের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঃ—

"পুত্রকলত্রের মুখ দেখিলে আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিনই সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

স্বজনরক্ষার চেয়ে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম আর দেশকে মুক্ত করতে হ'লে ঘরকে যে ছাড়তে হবে—এই বাণী শোনালেন

বঙ্কিম। এই বাণীই বাঙালীর ছেলেকে ছিনিয়ে এনেছে প্রিয়জনের বাহুবন্ধন থেকে—তাকে ঠেলে দিয়েছে মুক্তপথের ধূলিধূসরিত বক্ষে যেখানে অনাহার আর বিদ্রূপ, কারাগার আর মৃত্যু।

স্বজনপ্রীতির আইডিয়ালকে যেমন তিনি ভাঙলেন, তেমনি ভাঙলেন রাজভক্তির আইডিয়ালকে। রাজা বলতেই ভারত-বাসীর মনে উদ্রেক হয়েছে—ভীতিমিশ্রিত বিপুল শ্রদ্ধার। রাজার আদেশকে কোনোদিন অমান্য করা যেতে পারে—এ আদর্শ আমাদের চিত্তে কখনো ঠাঁই পায় নি। বঙ্কিম দেখলেন, জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্যকে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করতে হ'লে রাজভক্তির আদর্শকে ম্লান ক'রে দিতে হবে। আনন্দমঠে ভবানন্দকে দিয়ে তাই তিনি বলালেন,—

"যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি ?"

ধর্ম্মতত্ত্বে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ?"

গুরু উত্তর দিলেন,

"কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজা-পীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাকুক, যাহাতে সে সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা করাই দেশবাসীর কর্ত্তব্য।"

ইহার উপরে টিকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

স্বজনপ্রীতির আর রাজভক্তির আদর্শ ছাড়া আর একটা আদর্শকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলেন তিনি। এটি হ'লো অহিংসার খৃষ্টানী অথবা বৈষ্ণবী আদর্শ। 'মেরেছিস্ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না'—এই অহিংসার আইডিয়ালকে তিনি সম্পূর্ণ Hindu Ideal ব'লে স্বীকার করলেন না। আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে তিনি দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা-করলেন,

"প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ—দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।"

কৃষ্ণচরিত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথা লিখেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম ঃ—

"অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধের সমালোচনা কালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।"*

* কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র—১২৫ পৃঃ (বসুমতী সংস্করণ)।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শত শত বক্তৃতামঞ্চ থেকে একথা উচ্চারণ করবার প্রয়োজন আছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা প্রচারিত নম্রতার এবং ধৈর্য্যের আদর্শকে তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম এবং Hindu Ideal ব'লে বিশ্বাস করতেন না।

ঠিক যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মকে অর্থাৎ "মেরেছিস কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দেবো না"—এই অহিংসার আদর্শকে অর্থাৎ সর্ব্বঅবস্থায় তৃণের চেয়ে নম্র এবং তরুর মতো সহিষ্ণু থাকার idealকে "অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা" ব'লে ঘোষণা করেছেন—ঠিক সেই কারণেই তিনি কৃষ্ণচরিত্রে 'এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেওয়া'র Christian Idealএর চেয়ে 'বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলে পাপ হয়'—এই Hindu Idealকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে গিয়েছেন। তিনি যে চৈতন্য-চরিত্র, যীশু-চরিত্র অথবা বুদ্ধ-চরিত্র না লিখে 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন তার কারণ "অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে"—এই Hindu Idealকে তিনি মূর্ত্ত দেখেছিলেন কৃষ্ণের মধ্যে—জয়দেবের কৃষ্ণের অথবা যাত্রার কৃষ্ণের মধ্যে নয়—মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে। জয়দেবের কৃষ্ণ অথবা যাত্রার কৃষ্ণ তো দুষ্টের দমন করেন না; তিনি কেবল বংশীবাদক আর গোপিনীদের মন-চোর। মহাভারতের কৃষ্ণের হাতে বাঁশী নয়,

পাঞ্চজন্য। তিনি শিখীপুচ্ছধারী ঝুলনের প্রেমময় কৃষ্ণ নন, তাঁর হাতে অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথের ঘোড়ার লাগাম। সেই রথের রক্তসিক্ত চক্রের ঘর্ঘরশব্দে কুরুক্ষেত্রের বিরাট প্রান্তর মুখরিত। গীতার যিনি কৃষ্ণ তাঁর কণ্ঠে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' নয়; তিনি বলেছেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ' অর্থাৎ I am Time the Destroyer of beings. অর্জ্জুন যখন অনার্য্যসুলভ করুণার দ্বারা অভিভূত হ'য়ে কৌরবগণকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হ'লেন—তখন কৃষ্ণ বললেন, ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে—অর্থাৎ তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবুও মৃত্যুর হাত থেকে এরা কেউ রক্ষা পাবে না—কারণ অন্যায় যারা করেছে, ম'রে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। যারা ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বিপুল অন্তরায়—সেই দুর্য্যোধন আর দুঃশাসনদের অন্যায়কে নীরবে সহ্য করবার বাণী নিঃসৃত হয়নি মহাভারতের কৃষ্ণের মুখ থেকে। তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন গাণ্ডীব ধরে যুদ্ধ ক'রতে, শত্রুকে জয় ক'রে ললাটে যশের মালা পরতে, সমৃদ্ধ রাজ্যের নিষ্কাম অধীশ্বর হ'তে। জাতীয়-জীবনের কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমরা কপিধ্বজ রথের সারথি কৃষ্ণকে ভুলে গেলাম—কৃষ্ণকে তৈরী করলাম জয়দেব গোঁসাইয়ের মোহনমুরলীধারী বনমালী ক'রে। মহাভারতের প্রচণ্ড-মনোহর কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার সেই সর্ব্বনেশে মুহূর্ত্ত থেকে সুরু হোলো আমাদের জাতীয় অধোগতির দিন। কুরুক্ষেত্রের গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদের কাছে আর

ভক্তের আদর্শ হ'য়ে রইলেন না। আমরা তাঁকেই আদর্শ বৈষ্ণব ব'লে মনে করতে শিখলাম যিনি কেবল তরোরিব সহিষ্ণু আর তৃণাদপি স্থনীচ—যাঁর শুধু নামে রুচি এবং জীবে দয়া। বড় দুঃখেই বঙ্কিম লিখলেন,—

"...যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।"*

বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করবার কার্য্যে ব্রতী হ'লেন কেন? ঠিক যে কারণে Patriotismকে তিনি স্বধর্ম্ম পালন ব'লে ঘোষণা করলেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে আদর্শ-পুরুষ ব'লে তুলে ধরলেন তাঁর স্বদেশবাসীর সম্মুখে। আগেই ত বলেছি বারম্বার, বঙ্কিমের সারা হৃদয়কে জুড়ে ছিলো একটিমাত্র বিরাট স্বপ্ন—গতগৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব জন্মভূমিকে সম্পদ, জ্ঞান এবং শৌর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে রূপান্তরিত করবার স্বপ্ন।

"চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই যে "মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"—এই কয়েকটি কথার মধ্যে বঙ্কিমের মর্ম্মের যে আসল রূপ—তারই সন্ধান পাই। বাহিরে যিনি খেতাবধারী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন,

* কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র—১০৫ পৃঃ।

তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হোতো একটিমাত্র কান্না—"মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?"

"উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা !"

জননী জন্মভূমিকে সম্পদের, জ্ঞানের, শৌর্য্যের উচ্চতম শিখরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য প্রাণ যাঁর এমন ক'রে কেঁদেছিলো, তিনি কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। ধ্যানের মাতৃভূমিকে বাস্তবের মধ্যে সত্য ক'রে তুলবার জন্য কি কি প্রয়োজন, তার কথাও গভীরভাবে তিনি চিন্তা করেছিলেন। আর চিন্তা ক'রে তিনি দেখেছিলেন, স্বদেশকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পরাধীনতা, বঙ্কিম যাদের 'পররাজ্যাপহারক বড় চোর' বলতেন—সেই ইম্পিরিয়ালিষ্টদের তস্করতা। এই তস্করতার হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার উপায় কি ? বঙ্কিম বললেন, উপায় দুটি—Patriotism অর্থাৎ দেশপ্রীতি এবং Valour অর্থাৎ শৌর্য্য। সাম্রাজ্যবাদী তস্করদের হাত থেকে স্বদেশরক্ষাকে তিনি পরমধর্ম্ম ব'লে প্রচার করলেন। বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রে লিখলেন,—

"ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice ; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism ; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্ম পালন।"*

* কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র—১২৩ পৃঃ (বসুমতী সংস্করণ)।

কিন্তু তস্করদের হাত থেকে নিজস্ব রক্ষা করতে হ'লে প্রেমের চেয়ে শক্তির প্রয়োজন বেশী। যারা তস্কর তারা তো দমননীতির আশ্রয় নেবে স্বদেশ-রক্ষার চেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য। সেই দমন করবার শক্তিকে পঙ্গু করবার উপায় যুক্তি-তর্ক আর আবেদন-নিবেদন নয়—পররাষ্ট্রলোলুপ তস্করদের দমননীতিকে ব্যর্থ করবার উপায় বিরাট জাতীয় শক্তির উদ্বোধন। জাতিকে দেখাতে হবে, যারা বড় চোর তাদের শক্তির ঔদ্ধত্যকে বিপুলতর শক্তি দিয়ে বাধা দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্যায়ের ঔদ্ধত্যকে বাধা দেওয়ার আদর্শ তো আমাদের মনকে কোনো দিন তেমন ক'রে নাড়া দেয়নি। আমাদের দেশে যাঁরা সাধু, তাঁরা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শকেই সব চেয়ে উঁচু আদর্শ ব'লে ঘোষণা ক'রে এসেছেন। বঙ্কিম তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন, ধার্ম্মিকতার এই অসম্পূর্ণ আদর্শ যত দিন দেশবাসীর চিত্তকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করবে ততদিন স্বদেশের উদ্ধার অসম্ভব। কামিনীকাঞ্চনত্যাগ, সহিষ্ণুতা, নম্রতা—এসব আদর্শের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বদেশকে সাম্রাজ্যবাদীর নাগপাশ থেকে উদ্ধার করতে হ'লে ধর্ম্মের নূতন আদর্শকে জনগণের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের সামনে উঁচু ক'রে ধরতে হবে শৌর্য্যের আদর্শকে—তাদের বলতে হবে, পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পাপ, যারা পাপাচারী তাদের দমনই হোলো সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। এই শৌর্য্যের

আদর্শকে বঙ্কিম মূর্ত্ত দেখলেন মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে। তাই যে গীতার কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম, সেই গীতার কৃষ্ণকে তিনি আমাদের সামনে বড় ক'রে ধরলেন—হারানো স্বাধীনতাকে আমরা যাতে ফিরে পাই—তারই জন্য। একদিকে আমাদের মধ্যে ঐক্যের একান্ত অভাব এবং আর একদিকে আমাদের দাসসুলভ নম্রতা ও সহিষ্ণুতাই যে 'বড় চোর'দের হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার পথে সব চেয়ে প্রবল অন্তরায় হয়ে আছে—একথা বঙ্কিম খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। জাতির চিত্তে সুতীব্র দেশাত্মবোধকে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই অনৈক্যকে দূরীভূত করা সম্ভব—একথা বঙ্কিম বুঝেছিলেন ব'লেই তিনি এক দিকে আমাদের দিলেন religion of Patriotism, আর এক দিকে আমাদের হৃদয় থেকে নম্রতার ও সহিষ্ণুতার আদর্শকে অপসারিত করবার জন্য তিনি আমাদিগকে দান করলেন religion of Valour. আনন্দমঠে religion of Patriotism প্রাধান্য লাভ করেছে; কৃষ্ণচরিত্রে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে religion of Valour. সাহিত্য-চর্চ্চা বঙ্কিমের কাছে বিলাসের ব্যাপার ছিল না। তিনি যা লিখেছিলেন—তা হৃদয়ের রক্ত দিয়েই লিখেছিলেন একটা অধঃপতিত মহাজাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য।

আর একটা কথা ব'লে এই দীর্ঘ অভিভাষণের অত্যাচার থেকে আপনাদের রেহাই দেব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বদেশকে কেবল

যে পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, তা নয়। কেবল Patriotismএর মন্ত্র প্রচার ক'রে তাঁর উদার দরদী হৃদয় তৃপ্ত থাকতে পারে নি। স্বদেশের মঙ্গল বলতে তিনি বুঝেছিলেন—ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল। জওহরলালের আর গান্ধীজীর কণ্ঠে স্বরাজের যে আদর্শের কথা আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি—সেই কৃষক আর মজুরের কল্যাণের আদর্শকে বঙ্কিমই প্রথম ঘোষণা কর্‌লেন কম্বুকণ্ঠে। যে মঙ্গলের আদর্শ বলতে কেবল লেখাপড়া-জানা বাবু সম্প্রদায়ের কল্যাণ বোঝায়, তাকে তিনি দেশের কল্যাণ বলতে একেবারেই রাজী হলেন না। দেশ বলতে তিনি বুঝতেন, দেশের সাত লক্ষ পল্লী আর দেশের কল্যাণ বলতে তিনি বুঝতেন, এই সাতলক্ষ পল্লীর প্রত্যেকটি কৃষকের গৃহে অন্নের আর বস্ত্রের প্রাচুর্য্য। 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধের মধ্যে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

"আজিকালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদের দেশে বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। ...

"এই মঙ্গলের ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে। উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?

"বল দেখি চষমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ তুমি বল দেখি যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

"আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না।...দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আর আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কিনা হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।"

মনে রাখতে হবে—বঙ্কিম যখন উপরের কথাগুলি লিখে দেশের জনসাধারণের অসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্ম হয় নি, জওহরলাল ফৈজপুর কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে গণসংযোগের আদর্শকে ঘোষণা করেন নি, করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকারগুলির তালিকা তখনও নিমজ্জিত ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। বঙ্কিম যখন লিখেছিলেন,

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি

বৃহৎ মৎস শফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।" *—

তখনও দেশের সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণীর কণ্ঠ থেকে Economic Swaraj, Socialism আর Class Warএর sloganগুলি উৎসারিত হয় নি।

এর পরেও কি অরবিন্দের ভাষায় বলব না—

"Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru ?

সাম্যের আর স্বাধীনতার যে জয়ধ্বজাকে আমরা আজ বহন ক'রে চলেছি বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে—সেই জয়ধ্বজাকে বঙ্কিমই প্রথম দান করলেন তরুণ ভারতবর্ষের হাতে। তিনি যে মন্ত্র শোনালেন আমাদের কানে—তারই সাধনায় আমরা আজও ব্রতী। সেই ঋষিকে, সেই স্রষ্টাকে, সেই বন্দে মাতরম মন্ত্রের মৃত্যুহীন উদ্গাতাকে আজ আমরা সসম্ভ্রমে প্রণাম করি। বন্দে মাতরম্।

* 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

সাম্যবাদী বঙ্কিম

বঙ্কিম এ দেশে সাম্যবাদের অগ্রদূত। কার্ল মার্ক্সের মতো তিনি দেখেছিলেন জগৎ জুড়ে রয়েছে দুটো দল। একটা দলে রয়েছে কোটি কোটি নরনারী যারা জানে না পেট ভরে খাওয়া বলে কাকে। এদের না আছে ভালো ঘর-বাড়ী, না আছে শীত-নিবারণের উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ। দ্বিতীয় দলে রয়েছে লক্ষ্মীঠাকরুণের সেই সব মুষ্টিমেয় বরপুত্র যাদের কাছে দারিদ্র্যের দুঃখ একেবারেই অজ্ঞাত। এই উভয় দলের অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য, তা সত্য সত্যই অসহনীয়। একদিকে মুষ্টিমেয় ধন-কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর এবং আর একদিকে সংখ্যাহীন মানব-মানবীর দুঃসহ দারিদ্র্য—এই উভয়ের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য বঙ্কিমের চোখে অত্যন্ত উগ্র হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রবন্ধে আছে,

'যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্র সহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান

করিতেছে ; তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লূন লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোয়ালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার সময়, হয় জমীদার নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়তো চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে ? উপবাস—সপরিবারে উপবাস ”

নিঃস্ব চাষী ও ধন-কুবের জমীদার—এই উভয়ের সম্পর্ককে বঙ্কিম কি চোখে দেখেছিলেন, তার পরিচয় 'সাম্য' প্রবন্ধের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাম্যের যে পরিচ্ছেদটি থেকে উপরের অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে সেই পরিচ্ছেদেরই অন্যত্র রয়েছে,

'চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায় চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে ! স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কৰ্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমতাবস্থায় যতশীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।”

এমন কথা প্রবীণদের কণ্ঠে শোনা যায়—বঙ্কিম 'সাম্য' প্রবন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রকৃত মত নয়। তিনি পরিণত বয়সে সাম্য প্রবন্ধটিকে

প্রত্যাহার করেছিলেন। এ কথা যদি সত্যও হয় তবুও বঙ্কিম যে মনে প্রাণে সাম্যবাদী ছিলেন—এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের পাঠক-পাঠিকাগণকে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি পাঠ করবার জন্য একবার অনুরোধ করি। সাম্য প্রবন্ধে জমীদার ও কৃষক—এতদুভয়ের সম্পর্ক যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'বঙ্গদেশের কৃষকে' সে ভাষা আরও বিষ উদ্গীর্ণ করেছে। বঙ্কিম লিখেছেন,

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষক পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশীর উপর টাকার রাশী ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।"

সাম্য প্রবন্ধটিকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ-বয়সে প্রত্যাহার করেছিলেন —এ কথা সত্য হলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে যে অংশ উপরে উদ্ধৃত করা গেল—সে অংশকে কোথাও তিনি প্রত্যাহার করেছেন—এমন কথা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। আমার বেশ মনে আছে—কিছুকাল আগে ডাঃ কালিদাস নাগ 'হরিজন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে

বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্যবাদীরূপে তিনি চিত্রিত করেন। বঙ্কিম যে সাম্যবাদী ছিলেন—একথা প্রতিপন্ন করবার জন্য ডাঃ নাগ 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির উপরে বিশেষ জোর দেন। সাম্য প্রবন্ধকে যদি কেউ অস্বীকারও করেন, তবুও বঙ্কিম যে সাম্যবাদী ছিলেন—একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাম্যের দুইটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে—একথা সত্য ; কিন্তু সেই অংশ-গুলিকে বর্জ্জন করলেও এমন অনেক কথা 'বঙ্গদেশের কৃষকে' রয়েছে যার মুকুরে বঙ্কিমের সাম্যবাদীরূপকে আমরা নিঃসংশয়ে আবিষ্কার করতে পারি। বঙ্কিম যে জমীদার-সম্প্রদায়কে কৃষকদের শত্রু ব'লে মনে করতেন—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। দেশের পক্ষে জমীদারী প্রয়োজনীয় অথবা উপকারী—এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করতেন না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে আছে,

"পাঁচ-সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে—ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে ?…দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙাল, আজ পাঁচ-সাতজন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল ? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই।……

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।"

"ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়।"

'বঙ্গদেশের কৃষকে' বঙ্কিম এই অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের শিখরে সমাসীন যারা, তারা কেন স্বেচ্ছায় সম্পদের উপরে সবাইকে ভাগ বসাতে দেবে? মানুষ ত' স্বেচ্ছায় তার স্বার্থকে ত্যাগ করে না। মার্ক্সবাদীরা ব'লে থাকেন সামাজিক সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। সেই সম্পদকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিতে ধনীরা যখন একান্তই নারাজ—তখন বঞ্চিত সর্ব্বহারাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে সম্পদকে মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকার থেকে ছিনিয়ে সকলের মধ্যে তাকে বণ্টন করে দেওয়া। এই যে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপার—একে এ্যানার্কিষ্ট আর মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন expropriation. বঙ্কিমচন্দ্র মার্ক্সবাদী ছিলেন না এ্যানার্কিষ্ট ছিলেন—তা অবশ্য জানিনে। বোধ হয় পুরাপুরি কোনটাই ছিলেন না। কিন্তু expropriation-এর ব্যাপারটাকে বঙ্কিম যে অধর্ম্ম ব'লে মনে করতেন না—এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। কমলাকান্তের দপ্তরে অনশনক্লিষ্টা মার্জ্জারী কমলাকান্তকে বলছে,

"এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর

কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে, দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচতে গেলে খাওয়া-পরার উপরে দস্তুরমত অধিকার চাই—এ বিশ্বাসও বঙ্কিমের মনে অবিচলিত ছিল। কোটি কোটি মানুষকে অন্নবস্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা যে অন্যায়ের চরম—এ বিশ্বাসও কি বঙ্কিম মনের মধ্যে পোষণ করতেন না? সর্ব্বোপরি তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যদি স্বার্থপর ধনকুবেরদের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে সম্পদ জোর ক'রে ছিনিয়ে নেয়—তার মধ্যে অধর্ম্মের বিন্দুবিসর্গও থাক্‌তে পারে না—কারণ বঙ্কিমের ভাষায়, 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' সত্যিকারের অধার্ম্মিক যদি কেউ হয় তবে সে চোর নয়। আর কেউ। মার্জ্জারী কমলাকান্তকে বলছে,

"খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক! তাঁহাদের

চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে—কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়—চুরির মূল যে কৃপণ তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

বঙ্কিম কেবল যৌন প্রবৃত্তির উদ্দামতা, কুক্কুরজাতীয় পলিটিক্স আর সাহেব সাজবার হীন অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে আঘাত দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। ধনবৈষম্যকেও তিনি যথেষ্ট আঘাত দিয়েছেন। আর আঘাত দিয়েছেন কখন? যখন মার্ক্সবাদের কথা এদেশে এসে পৌঁছায় নি, সোস্যালিজম, কমিউনিজম ইত্যাদি 'ইজ্‌মের' কথা এদেশে কেউ জানত না, জওহরলাল আর গান্ধী ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন। যারা সাম্যবাদী তাদের লক্ষ্য হচ্ছে—সকলের কল্যাণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরাট লক্ষ্যের বেদীমূলে আপনার প্রতিভাকে নিবেদন করেছিলেন। দেশের মঙ্গল বলতে তিনি মুষ্টিমেয় বুর্জ্জোয়াদের মঙ্গল বুঝতেন না, বুঝতেন দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল।

"দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন?······যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বঙ্কিম এ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে। তখনও বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠ থেকে উৎসারিত দরিদ্র-নারায়ণের

সেবার মন্ত্র ভারতের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত ক'রে তোলে নি। এদেশের নিরন্ন জনসাধারণের মঙ্গল আর স্বরাজ যে একই কথা—এ বাণী ঘোষণা করবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তখনও গান্ধীর আবির্ভাব হয় নি। ভারতবর্ষ তখন মৌন বিজন বনানীর মত। সেই বনানীর তিমিরাচ্ছন্ন বুকে গণ-মঙ্গলের প্রভাতজ্জ্যোতি নিয়ে এল সাম্যবাদী বঙ্কিমের অনন্য-সাধারণ প্রতিভা।

বঙ্কিম একদিকে যেমন কষাঘাত করলেন শ্রেণীর প্রতি শ্রেণীর (Capitalism) অত্যাচারকে, আর একদিকে তেমনি আঘাত হানলেন জাতির উপরে জাতির আধিপত্যকে (Imperialism)। জাতি কর্ত্তৃক জাতির স্বাধীনতা হরণকে তিনি সোজা ভাষায় চৌর্য্য বলেছেন। সাধারণ ছিঁচ্‌কে চোর আর সাম্রাজ্যবাদী বড় চোরের মধ্যে পার্থক্য যে খুব অল্পই—একথা বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন—

"কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।"

বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism—বঙ্কিমের কাছে এই ছিল স্বদেশ-প্রেমের সরল অর্থ। কমলা-কান্তের জবানবন্দীতে কমলাকান্ত চোরকে গরু ছেড়ে দেবার জন্য প্রসন্ন গোয়ালিনীকে যে কারণ দেখিয়েছে—তা পাঠ করলে দেখা যাবে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব কিরূপ ছিল। কমলাকান্ত বলছে,

"পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস! গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের উপরে মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।' এই হল ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার International Law. যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্য। সেকেন্দর হইতে রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা Right হয়, তবে Right of theft কি একটা Right নয়?"

সাম্রাজ্যবাদকে এমনি তীব্র ভাষায় বঙ্কিম আক্রমণ করেছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছিলেন তার মূলে ছিল স্বদেশরক্ষার প্রেরণা আর এই স্বদেশরক্ষা বলতে তিনি বুঝেছিলেন শৌর্য্যের দ্বারা চৌর্য্যের অবসান। যা ন্যায় তারই পূজায় বঙ্কিম আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন আর সেই জন্য বৈষম্যকে কোনক্ষেত্রেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। যেমন রাজনীতির এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে—তেমনি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি উড্ডীন করতে চেয়েছিলেন সমানাধিকারবাদের জয়নিশান। সেই সাম্যবাদের অগ্রদূতের চরণ-কমলে দীনভক্তের শতসহস্র প্রণাম নিবেদন ক'রে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি।

যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র

জীবনের মূলে যারা বাসা নেয়, তাদের আমরা অনেক সময়ে ভুলে থাকি। আমরা ভুলে থাকি আকাশের তারাকে, বনের ফুলকে—তবুও তারা প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে সুমধুর করে, ভুলের শূন্যতাকে সুর দিয়ে ভরিয়ে রাখে। এমন যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য—সেও ত অনেক সময়ে আমাদের চেতন মনের বাহিরে থাকে। কিন্তু এই ভুলে থাকার নাম ত ভোলা নয়। সূর্য্য আর তারা আর ফুল বিস্মৃতির মর্ম্মে ব'সে আমাদের রক্তে দেয় নিরন্তর দোলা। পৃথিবীতে যা-কিছু বিরাট, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু প্রাণস্পর্শী—তাদের সান্নিধ্যে যখনই আমরা আসি, তখন থেকেই তারা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, আমাদের সত্ত্বা থেকে তাদের আর পৃথক ক'রে দেখ্‌তে পারি নে। বাহিরের কোন কিছুকে অবলম্বন ক'রে তাদের স্মরণ কর্‌তে যাওয়া এক হিসাবে প্রকাণ্ড একটা ভুল।

বঙ্কিমের গগনস্পর্শী প্রতিভাকে স্মরণ কর্‌তে যাওয়ার মধ্যে এই রকমের একটা ভুল আছে। আমাদের জীবনের ঠিক কোন্‌খান থেকে তাঁর প্রভাব সুরু হয়েছে—তা আবিষ্কার করা কঠিন। বাতাসের সঙ্গে যেমন ফুলের গন্ধ মিশে থাকে, বঙ্কিম তেমনি ক'রেই মিশে আছেন আমাদের কৈশোরের অসংখ্য স্বপ্নের সঙ্গে। চাঁদের আলোয় ঠাকুরমার মুখ থেকে

রূপকথার গল্প শোনাকে যেমন জীবনের প্রভাত থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌তে পারি নে, তেমনি বঙ্কিমকেও আমাদের জীবন-প্রভাতের সহস্র স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার কোন উপায় নেই। সেই অতীতের অস্ফুট চন্দ্রালোকে জেগে আছে বালক প্রতাপ আর বালিকা শৈবলিনীর ছবি। ভরা গঙ্গায় দু-জনে সাঁতার কেটে চলেছে পাশাপাশি। প্রতাপ ডুবছে আর মৃত্যুভয়ে শৈবলিনী ফিরে আস্‌ছে কূলে। সেখানে জাগছে কাপালিকের খড়্গ এবং তার রক্তচক্ষুর পার্শ্বে বন্দী নবকুমারের ম্লান মুখচ্ছবি। সেই বাল্যের আলো-অন্ধকারে মেশা জগতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি কাপালিকের খড়্গ দিয়ে নবকুমারের লতাবন্ধন ছেদন করচে। বন্দীর সেই মুক্তির আনন্দ কি আমাদের কৈশোরের সহস্র আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে নেই? সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিশোর বয়সের কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র যার পটভূমিতে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত ক'রে নির্ণিমেষলোচনে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণা অনিন্দ্য-সুন্দরী কপালকুণ্ডলা। সপ্তগ্রামের নিবিড় অরণ্য-পথে একাকিনী কপালকুণ্ডলা যেখানে ঔষধের সন্ধানে চলেছে, সেখানে ভয়-মিশ্রিত আনন্দের মধ্যে কিশোর হৃদয়ের কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে আমরাও বারম্বার তার সাথী হয়েছি। পরিশেষে অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহের মধ্যে কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক জীবন যেখানে বিলুপ্ত হয়ে গেল আমাদের কিশোর মনের শূন্যতার হাহাকারের

মধ্যে, সেখানকার অশ্রু-সজল স্মৃতি অতীতের আরও বহু স্মৃতির বেদনার সঙ্গে কি মিশিয়ে নেই?

আমাদের ছেলেবেলার কল্পনাকে বঙ্কিম যেমন ক'রে নাড়া দিয়েছেন এমন ক'রে তাকে নাড়া দিয়েছে আর কে? বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে অশ্বারূঢ় জগৎসিংহ গড়মান্দারণের পথে চলেছেন একাকী। প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যে সেই নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের ছবিকে কল্পনা ক'রে আমাদের বাল্যজীবনের কত মুহূর্ত্ত ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। জনহীন প্রান্তরে শৈলেশ্বরের মন্দির বর্শাধারী জগৎসিংহ, অবগুণ্ঠিতা তিলোত্তমা, শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি আর চতুরা বিমলাকে নিয়ে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির সঙ্গে আজও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের কল্পনার জগৎ বঙ্কিমের মানসপুত্র আর মানসকন্যাগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। সেখানে সুন্দরী তিলোত্তমা আপনার অজ্ঞাতসারে পালঙ্কের কাষ্ঠে লিখছে 'কুমার জগৎসিংহ' আর সেই লেখা পড়ে লজ্জায় তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। জল দিয়ে বারে বারে প্রিয়তমের নামটী ধৌত ক'রেও বীরেন্দ্র সিংহের কন্যার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সেখানে চন্দ্রালোকিত রজনীতে বজরার ছাদের উপরে বহুরত্নমণ্ডিতা দেবী চৌধুরাণী বীণা বাজায়, শত শত বীর-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবীর আদেশ পালন করে। সেখানে ভবানী পাঠকের নির্দ্দেশে প্রফুল্ল বাছা বাছা লাঠিয়াল-দের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, নিভৃত মন্দিরমধ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষা নেয়, স্বামীর স্বদেশ-

সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য কল্যাণী বিষ খায়, মুখে বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে ভবানন্দ মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সেখানে মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহায় পৃষ্ঠচ্ছেদী উপল-শয্যায় শুয়ে কলঙ্কিনী শৈবলিনী দেখে নরকের বিভীষিকা, চাঁদের আলোয় স্থির গঙ্গার মাঝে চন্দ্রশেখরের হতভাগিনী স্ত্রী প্রেমাস্পদের হাতে হাত রেখে বাষ্পবিকৃত স্বরে প্রতিজ্ঞা করে,

শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতেই আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।

সেখানে শৈবলিনীর আর চন্দ্রশেখরের দাম্পত্য জীবনকে সুখী করবার জন্য প্রতাপ অশ্বারোহণে চলেছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, রমণীরত্ন আয়েষা স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরায় অলঙ্কার। সেখাতে নৃত্যগীত-কৌতুকে মত্ত কতলু খাঁর বক্ষস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিয়ে বিমলা বল্‌ছে,—

"পিশাচী নহি, শয়তানী নহি, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী।"

সেখানে মহামহীরুহের শ্যামল পল্লবরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে তেজস্বিনী শ্রী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য জনতাকে দেয় প্রেরণা, একাকিনী চঞ্চলকুমারী সশস্ত্র মোগল অশ্বারোহী-দের সম্মুখে যায় এগিয়ে, রূপনগরের বিপন্না রাজপুত্রীকে উদ্ধার করবার জন্য রাজসিংহ করে সর্ব্বস্ব পণ। সেখানে বারুদমাখা সীতারামের অব্যর্থ সন্ধান শত্রুসেনাকে করে ছিন্নভিন্ন, রাজমহিষী নন্দা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় জয়ন্তীকে

করে উদ্ধার, রুধিরাক্ত কলেবরে বীরেন্দ্র সিংহ নিষ্কোষিত অসিহস্তে করে সংগ্রাম, সেখানে জগৎসিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ওসমান ধরাশায়ী, পর্ব্বতের শিরোদেশে দাঁড়িয়ে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক মোগল সৈন্যবাহিনীর উপরে করে শিলাবৃষ্টি, শাহানশাহ বাদশাহ হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ নামিয়ে রেখে নতজানু হয়ে মাথায় দেন পর্ব্বতের কাঁকর। সেখানে গভীর রাত্রে চন্দ্রশেখর নিদ্রিতা শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলের পানে চেয়ে নিঃশব্দে করে অশ্রুমোচন, অভাগিনী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের চরণে মাথা রেখে নবীন যৌবনে মরণের অন্ধকারে যায় বিলুপ্ত হ'য়ে, অভিমানিনী ভ্রমর গোবিন্দলালের পদরেণু মাথায় নিয়ে চির-নিদ্রার কোলে পড়ে ঘুমিয়ে। সেখানে রোহিণী সুন্দরী বারুণী পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে কলসী ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে কাঁদে, কৃষ্ণকান্ত রায় শয়ন-মন্দিরে উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা ক'রে আফিমের নেশায় ঝিমায়, রত্নখচিত পালঙ্কে শুয়ে শাহজাদী জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য চোখের জলে বুক ভাসায়।

বাংলা সাহিত্য যত কাল বেঁচে থাকবে তত কাল বাঙালীর মনের মধ্যে বঙ্কিমও সগৌরবে বেঁচে থাকবেন। বন্দেমাতরম্ যাঁর কণ্ঠ থেকে প্রথম উৎসারিত হয়েছে, কমলাকান্তের দুর্গোৎসব বেরিয়ে এসেছে যাঁর লেখনী থেকে, লোকরহস্য আর মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত লিখে, দিগ্‌গজ গজপতির আর গোবরার মা'র ছবি এঁকে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে যিনি অফুরন্ত হাস্যরস বিতরণ করেছেন, যাঁর লেখার

মধ্যে আজও লক্ষ লক্ষ বাঙালী এবং অ-বাঙালী খুঁজে পায় চিত্তের অনাবিল আনন্দ—আমাদের মনের মন্দিরে প্রভাত-সূর্য্যালোকে আলোকিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী মহিমায় তিনি জেগে রইবেন চিরদিন। চির-অম্লান দিগ্বিজয়ী প্রতিভা নিয়ে তিনি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন থাকবেন জাতীয়তার প্রথম পুরোহিতরূপে, বাংলার সাহিত্যিকগণের সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করবে তাঁর জন্মভিটা, স্বাধীনতার পর্ব্বত-শিখরে আরোহণের পথে তাঁর গ্রন্থ আমাদের অবসাদ কর্‌বে দূর, আমাদের হৃদয়ে দেবে প্রেরণা। নবীন বাংলার এবং নবীন ভারতবর্ষের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সকলের শীর্ষে বঙ্কিমের নাম জেগে থাকবে আকাশের জ্বলজ্বলে শুকতারার মত। তিনি আমাদের প্রাণের বেদীতে রাজোচিত গরিমায় জেগে রইবেন তাঁর মাধবাচার্য্য, রামদাস স্বামী, সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক আর অভিরাম স্বামীকে নিয়ে। বাঙালী কি কোনদিন ভুল্‌তে পারবে সূর্য্যমুখীকে আর রোহিনীকে, সুন্দরীকে, রজনীকে আর মৃণালিনীকে, কমলমণিকে আর শ্যামাসুন্দরীকে, দরিয়াকে আর নির্ম্মলকুমারীকে, দলনী বেগমকে আর লুৎফ-উন্নিসাকে, সর্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর হীরাকে আর ফুলমণি নাপিতানীকে ?

বঙ্কিম বাঙালীর বড় আদরের ধন, বঙ্কিম বাঙালীর আত্মীয়ের চেয়েও পরমাত্মীয় ; বঙ্কিমকে বাদ দিয়ে বাঙালী নেই, বাঙালীকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম নেই। বঙ্কিম আমাদের প্রাণের এমন সব

নিভৃত তারে আঘাত ক'রে থাকেন যেখানে আর কারও পক্ষে আঘাত দেওয়া একরকম অসম্ভব। বাঙালীর ভাবপ্রবণ চিত্তে আর কারও লেখা কি এমন ক'রে সাড়া জাগাতে পেরেছে?

কিন্তু সামান্য একটী প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমের বিশাল প্রতিভার সকল দিকের আলোচনা সম্ভবপর নয়, তাই আমি শুধু তাঁর সাহিত্যে প্রগতির দিকটাকে দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকব।

কেবল সুন্দরের পূজায় আত্মনিবেদন ক'রে বঙ্কিমের প্রতিভা সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা বাস্তবের দাবিকে ফাঁকি দিয়ে কল্পনার ইন্দ্রলোকে বাস করতে ভালবাসেন। এই জগতের লক্ষ লক্ষ ভাঙা হৃদয়ের কান্নার সুর তাঁদের প্রাণের উপকূলে গিয়ে পৌঁছায় না। রোম যখন পুড়ে যায় তখনও তাঁদের হাতে বাজে বীণা। দেশ জুড়ে যখন অত্যাচারের ঝটিকা বয় তখনও তাঁদের স্বপ্নবিলাসী মন কল্পলোকে করে বিচরণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম সুরটিও তাঁদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে না।

বাস্তবের দাবিকে এড়িয়ে যাবার এই যে অমার্জ্জনীয় ভীরুতা,এই ভীরুতার কালিমা বঙ্কিমের তেজস্বী হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। উদার-চিত্তের দিগন্ত-প্রসারী কল্পনার আলোকে বাস্তবের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের বীভৎসরূপ, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, মেরুদণ্ডহীন অসংখ্য নরনারীর পৌরুষের একান্ত দৈন্য, দেশব্যাপী তামসিক জড়তা এবং ক্লৈব্য। তিনি দেখেছিলেন

অনশনক্লিষ্ট সহস্র সহস্র গ্রামের দুর্ভিক্ষের দিগন্তব্যাপী ছায়া, দিকে দিকে বুভুক্ষু নরনারীর শীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অজ্ঞানের নিবিড়তম অন্ধকার। তিনি দেখেছিলেন শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব। তারা কেবল উমেদারীতে তৎপর, তাম্বুল-চর্ব্বণে উৎসাহী, তামাকু-সেবনে অভ্যস্ত এবং গৃহিণীতে অনুরক্ত। বঙ্কিমের অননুকরণীয় ভাষায়—

যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।

এই ইংরেজী-শিক্ষিত, পরানুকরণপ্রিয়, স্বার্থসর্ব্বস্ব, মনুষ্যত্ব-হীন চাকুরীজীবী ভদ্র-সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমের হৃদয়ে ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে বঙ্কিম এই খেতাবধারী, খোসামুদে, সাহেব-ঘেঁষা বাবু-সম্প্রদায়ের মুখোস খুলে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেবের দর্শনপ্রার্থী মুচিরাম বাহির থেকে সাহেবের মুখে 'নিকাল দেও শালাকো' শুনে যেখানে দুই হাতে সেলাম ক'রে বলছে 'বহুত খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে'—সেখানে বঙ্কিম শিক্ষা-ভিমানী ভদ্র-সম্প্রদায়ের নৈতিক অধোগতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। নিজের স্বদেশবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আত্মসম্মানবোধের একান্ত দৈন্য, মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব

তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিত। তাঁর ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে এই সুতীব্র বেদনার প্রকাশ, তাঁহার হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে চোখের জল।

বাস্তবের মধ্যে কোন সান্ত্বনাই নাই তিনি খুঁজে পাননি। সেখানে ছিল না কোনও আলো, ছিল না কোনও আশা, ছিল না কোনও আশ্রয়। শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দারিদ্র্য, ক্লৈব্য, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, উদ্যমের, ঐক্যের, সাহসের এবং অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। দেশ-জননী তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিলেন শীর্ণ মলিন মূর্ত্তিতে। পরাধীনতার গ্লানিকে বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন।

এই জন্যই কপালকুণ্ডলার মত নিছক সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে তাঁর প্রতিভা ক্ষান্ত থাকতে পারে নি। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস লিখেও তাঁর চিত্ত পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায়নি। কঠিন বাস্তব তাঁকে ডাক দিয়েছিল শৃঙ্খলিত হতভাগ্য জাতিকে নূতন ক'রে তৈরি করবার জন্য লেখনীকে তরবারির মত ধারণ করতে। বাস্তবের সেই দুর্জ্জয় আহ্বানে তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি। আর সেই সাড়া দেওয়ার ফলেই রাজসিংহ, আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র। নির্ব্বীর্য্য, শতধাবিচ্ছিন্ন, কর্ম্মকীর্ত্তিহীন স্বদেশকে নবজীবনের প্রভাত-অরুণিমার মধ্যে জাগানোর জন্য সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে তিনি দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন শৌর্য্যের আদর্শ,

ঐক্যের আদর্শ, দেশাত্মবোধের আদর্শ, আত্মসম্মানবোধের আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ। জনসাধারণের চিত্তে যতক্ষণ একটা বড় আদর্শকে সৃষ্টি করতে না পারা যায় ততক্ষণ গণতন্ত্র কেবল কথার কথা হয়ে থাকে। সাহিত্য জাতির মনে এই আদর্শকে সৃষ্টি করে। বঙ্কিম সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে তাই আদর্শ-প্রচারে ব্রতী হলেন।

অসামান্য প্রতিভার আলোকে বঙ্কিম দেখেছিলেন, এক-জাতীয়ত্ব ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নেই। ঐক্যের অভাবই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেছে—ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষকে নবজীবন দান করবে। এই ঐক্য আসবে জাতি-প্রতিষ্ঠার পথে। ভারতবর্ষে যদি কখনও জাতি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তবেই ভারতবাসীরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হ'লে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ কঠিন হবে না, আর ভারতবর্ষ যদি একবার স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়, তবে তার সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। বঙ্কিম তাই ভারতবর্ষকে কল্যাণের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, শক্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে রূপান্তরিত দেখবার জন্য দেশাত্মবোধের আদর্শকে প্রচার করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। "ভারত-কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর মনের কথা খুলে লিখেছেন। সেখানে আছে—

ইতিহাস-কীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ

করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এক আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল।

দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ। ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয়-বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল।···পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোনো প্রদেশখণ্ডে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কিনা হইতে পারিত?

এইখানেই পাই বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূল সূত্রটী। আনন্দ-মঠ লেখার নিগূঢ় রহস্য—সমুদয় ভারতবর্ষকে কি একজাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না? বাংলার সঙ্গে পঞ্জাবকে, মাদ্রাজের সঙ্গে আসামকে, বিহারের সঙ্গে গুজরাটকে, উড়িষ্যার সঙ্গে সিন্ধুকে কি প্রীতির দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেওয়া সম্ভবপর নয়? বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন, দুর্ভাগা ভারতবর্ষের মুক্তির পথ মৈত্রীর মধ্য দিয়ে—affection shall solve the problem of freedom yet. যারা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, জয়লাভ তাদের অনিবার্য্য। একের জন্য যেখানে হাজার জন তাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেখানে অকল্যাণ আসতেই পারে না। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান যদি প্রেমের মধ্যে এক হয়ে যায়,

ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়তে এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু ঐক্যের পথে, মিলনের পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় আদর্শের অভাব। সেই আদর্শ কোথায় যার পতাকাতলে আমরা হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমবেত হ'তে পারি? আমরা সকলের কথা কখনও ভাবিনি। আমরা ভেবে এসেছি কেবল নিজেদের কথা। আমাদের কল্পনা কেবল নিজের মুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে তার চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেয়েছি নির্ব্বাণ নিজের আত্মার কল্যাণ কামনা ক'রে। নির্ব্বাণের উপর জোর দিতে গিয়ে বাস্তবের সমস্যাগুলিকে করেছি উপেক্ষা। আমাদের বেদান্ত-সাংখ্যাদি দর্শনগুলি আমাদের চিত্তকে বহির্জগতের সমস্যাগুলি থেকে সরিয়ে এনে তাকে করেছে অন্তর্মুখী। আমরা রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণকে করেছি আশ্রয় এবং বৃহৎ জগতের বিশাল-চঞ্চল জীবনধারাকে করেছি অস্বীকার। ফলে এসেছে দেশব্যাপী নিশ্চেষ্টতা। কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্রমে পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। ইহজগতে আমাদের বাঁচার মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ দেখতে পাই পারিবারিক জীবনের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তির ভিতরে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচতে শিখিয়েছি কেবল পরিবারের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় স্বাধীনতা—এ সব আইডিয়া আমাদের হৃদয়ে কখনও প্রাধান্য লাভ করেনি। সাধারণ লোক ক্ষেতে খামারে কাজ করেছে, অবসর-সময়ে সতরঞ্চ, দাবা আর দশপঁচিশ

খেলেছে, জমিদারকে খাজনা দিয়েছে, শানায়ের সুরের মধ্যে ছেলের বৌ এনেছে আর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়েছে, সদলবলে মেলায় গিয়ে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনেছে, কামার বাড়ীতে গিয়ে দা আর বঁটি গড়িয়েছে, খামারের ধান গোলায় তুলেছে, সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনের রোলের মধ্যে দিবসের দুশ্চিন্তাকে ভুলেছে, উঠানে বেগুনের আর লঙ্কার চারা পুঁতেছে, পুকুরে মাছ ছেড়েছে, দোলের দিনে রং খেলেছে, রাত জেগে যাত্রা শুনেছে, পৌষ-সংক্রান্তির দিন পিঠাপুলি খেয়েছে, গ্রামসুদ্ধ লোক পৌষল্যার আনন্দে মত্ত থেকেছে, জ্ঞাতি শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহের সহিত দল পাকিয়েছে এবং সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার বিপদকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। দেশের স্বাতন্ত্র্য থাকল আর গেল—এ নিয়ে কখনও তারা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেনি। কোন্ রাজার আবির্ভাব ঘট্‌ল আর কোন্ রাজার তিরোভাব ঘটল—এ-চিন্তা কোনোদিনই তাদের মনকে নাড়া দেয়নি। "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন,

যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি-প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছে তখনই হিন্দু সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্যরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাঁহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য-পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই।

'সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই'—এই খানেই বঙ্কিম আমাদের অধঃপতনের মূল কারণটি আবিষ্কার করেছেন। আমাদের কল্পনা ওপারে ঘুরে বেড়িয়েছে কল্পিত স্বর্গের নন্দনকাননে আর এপারে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। আমরা আমাদের কল্পনাকে কখনও বিরাট দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে শিখিনি আর এই কল্পনাশক্তির দৈন্যের জন্যই আমাদের সর্ব্বাঙ্গে আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলভার।

বঙ্কিমই প্রথম আমাদের চিত্তকে গৃহপ্রাচীরের গণ্ডী আর নির্ব্বাণ-কামনার সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি দিলেন স্বদেশের বিশালতার মধ্যে, আমাদের দৃষ্টির অস্পষ্টতা দিলেন ঘুচিয়ে আর আমাদের আঁখির সম্মুখে উদঘাটিত করলেন দেশজননীর রূপ। এই উদার নবজীবনের মধ্যে আমাদের চিত্তের যে মুক্তি—তারই সুর বেজে উঠেছে বন্দেমাতরমের অমর সঙ্গীতের মধ্যে। মাৎসিনি যেমন ইটালিকে একরাজ্যভুক্ত করবার জন্য তার কানে দিলেন ইটালিয়ান রিপব্লিকের মহামন্ত্র, বঙ্কিম তেমনি একই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তার কানে শোনালেন বন্দেমাতরমের গায়ত্রীগাথা। বিসমার্ক যেমন শতধাবিচ্ছিন্ন জার্ম্মানীকে বেঁধে দিলেন ঐক্যসূত্রে, বঙ্কিমও তেমনি ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। বঙ্কিম ভারতের বিসমার্ক।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঋষিদৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন,

ভারতবর্ষকে তার অশেষ দুর্গতি থেকে মুক্ত করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব যদি জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জীবন্ত হয়ে না ওঠে। পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে তার চিত্তকে মুক্তি দিয়ে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে স্বদেশের উদার বক্ষের মধ্যে। জন্মভূমির চরণপ্রান্তে শতধাবিভক্ত দেশকে ঐক্যের মধ্যে মেলাতে হবে। আর্ট নয়, নির্ব্বাণ নয়, খ্যাতি নয়, বিষয়-সম্পত্তি নয়, ছেলেমেয়ের বিবাহ নয়, পল্লীর নিভৃত বক্ষে আমবাগানের শীতলছায়ায় শান্তির মধ্যে ডুবে থাকা নয়। দেশবাসীর চিত্তকে সকল ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে সেখানে একটী মাত্র সর্ব্বগ্রাসী কামনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সে কামনা হ'ল স্বদেশের মুক্তির কামনা। (তেত্রিশ কোটি নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে একটী মাত্র প্রতিমাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, সে প্রতিমা হ'ল জন্মভূমির স্বর্ণপ্রতিমা।) অমর উপন্যাস আনন্দমঠে মহেন্দ্রকে ভবানন্দ বলছেন,

> আমরা অন্য মা মানি না। জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—

মহেন্দ্র সিংহের কর্ণে এই যে অমূল্য কথাগুলি ভবানন্দ একদা উচ্চারণ করেছিলেন, এই কথাগুলির মধ্যে বাংলা দেশ একদিন খুঁজে পেল তার নবপ্রভাতের উদ্বোধন-মন্ত্র। সেই

মন্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষ আজ একাগ্রচিত্তে জপ করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। বঙ্কিম নেই—কিন্তু ভবানন্দের মুখ দিয়ে যে বাণী তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বিরাট দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

পারিবারিক জীবনের গণ্ডী থেকে বাঙালীর চিত্তকে মুক্ত করবার জন্য তিনি যে এতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন তার কারণ তিনি জানতেন দাম্পত্যপ্রেমের সঙ্কীর্ণতা দেশাত্মবোধের জাগরণের পথে সবচেয়ে প্রবল অন্তরায়। দেশাত্মবোধের কাজ হচ্ছে মানুষকে বহু জনের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করা, তার চিত্তকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। দাম্পত্য প্রেম দুজনের মধ্যে সংসারকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়—বাসরঘরের তপ্ত কোটরের মধ্যে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে স্থান দিতে একান্ত নারাজ। পারিবারিক জীবনে যারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত তারা বাহিরের মানুষগুলিকে দূরে ঠেলে রাখতে চায়। এই জন্যই আনন্দমঠের সন্তানদের জন্য গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা।

সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয় ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতাভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাসদাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতার কথা বঙ্কিমের অজানা ছিল না। এই জন্যই ইন্দ্রিয়জয় এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে না-বসা সন্তানধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। মেয়েদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল নীড় বাঁধা, পুরুষের কাজ সভ্যতাকে গ'ড়ে তোলা। সেই কাজকে সফল করতে হ'লে নীড়কে আঁকড়ে থাকলে চলে না। এই জন্যই দেখা যায়, যেখানে পুরুষের জীবনে সভ্যতার এবং সংস্কৃতির দাবি প্রাধান্য লাভ করেছে, সেখানে নারীর প্রেমের দাবি গৌণ হয়ে গেছে। ফ্রয়েড তাঁর Civilisation and its Discontents নামক পুস্তকে সংস্কৃতির আর দাম্পত্য-প্রেমের এই দ্বন্দ্বের কথা সুস্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

Since man has not an unlimited amount of mental energy at his disposal, he must accomplish his tasks by distributing his libido to the best advantage. What he employs for cultural purposes he withdraws to a great extent from women and his sexual life; his constant association with men and his dependence on his relations with them even estrange him from his duties as husband and father.

মানুষের মনে শক্তির একটা সীমা আছে। এই জন্যই তাকে কোন বড় কাজ করবার জন্য যখন শক্তি ব্যয় করতে হয় তখন নারী এবং যৌন জীবনের দিকে তার মন দেবার অবসর থাকে না। একটা মনকে আর কত দিকে দেওয়া যায়?

স্বামীর আর পিতার কর্ত্তব্য পুরাপুরি পালন করতে গেলে বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সময় থাকে না, আর বৃহৎ জগৎ থেকে যে মানুষ বিমুখ হয়ে থেকেছে মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে তার দানের পরিমাণ কখনও বেশী হ'তে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর দুর্ব্বলতা কোথায় তা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। আমাদের দুর্ব্বলতা আমাদের ঘরের মায়ায়। ঘরের প্রতি অত্যধিক মায়া, ভায়ের মায়ের অত্যধিক স্নেহ আমাদের চিত্তে দেশাত্মবোধের উন্মেষকে যে ঠেকিয়ে রেখেছে, মর্ম্মে মর্ম্মে বঙ্কিম তা উপলব্ধি করেছিলেন আর সেই জন্যই বাঙ্গালীকে কুটীরের আঙিনা থেকে টেনে এনে তাকে মুক্ত পথের বুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতাকে লাভ করতে হ'লে কেবল ঘরের মোহকে ভাঙলেই যথেষ্ট হবে না। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তিলাভ দেশাত্মবোধের অপরিহার্য্য অঙ্গ সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশকে আপনার করতে হ'লে শৌর্য্যও চাই। যারা বলহীন তাদের জন্য মুক্তির স্বর্গ নয়। স্বাধীনতা আসে শক্তি-সাধনার পথে, অত্যাচারের অবসান ঘটায় সাহস এবং

বীর্য্য। বাঙালীর এই শক্তিসাধনার পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় সৃষ্টি করেছে আমাদের ধর্ম্ম। যে দিন থেকে আমরা ভগবানের শিরে শিখীপুচ্ছ আর হাতে মোহন বাঁশী দিয়ে তাঁর মধুর রূপের উপাসনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাতে আরম্ভ করেছি—সেই দিন থেকে আমাদের জীবনে ক্লৈব্যের পালা সুরু হয়েছে। আমরা শক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে প্রেমের পথ ধরেছি, আর প্রেমের সাধনা করতে করতে অপদার্থ হয়ে গেছি। বহিঃশত্রু এসে আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের অধিকারে হাত দিয়েছে আর অপমানের মধ্যে টেনে এনেছে। আমরা কিল খেয়ে কিল চুরি করেছি আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অহিংসার মুখোস প'রে আমাদের ক্লৈব্যকে লুকিয়ে রেখেছি। কি কুক্ষণেই যে চৈতন্যদেব প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন! প্রেম শক্তিমানের ভূষণ, দুর্ব্বলের কলঙ্ক। যেখানে শৌর্য্য নেই সেখানে অহিংসা হ'ল ক্লৈব্যের পরিচয়। কিন্তু শৌর্য্য সেখানে আসবে কেমন ক'রে যেখানে ভগবান মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন কেবল প্রেমের ঠাকুর হয়ে, যেখানে তিনি কেবল সুন্দর?

বঙ্কিম তাঁর স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে স্থাপন করলেন ভগবানের প্রচণ্ড-মনোহর রূপ—যেরূপে তিনি দণ্ডধারী হয়ে শাসন করেন আর মৃত্যুকে বিকীর্ণ করেন দিকে দিকে। তিনি ভগবানের শক্তিময় রূপকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর দেশবাসী সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়মন্দিরে। যারা শক্তিহীন

কাপুরুষ তাদের কাছে Christian Ideal প্রচার করা অর্থহীন। Nothing is worthwhile unless it is strong, neither good nor evil. বঙ্কিম তাই দেশবাসীর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ব্যাখা উপস্থিত করলেন তার মধ্যে রয়েছে শক্তির বাণী। মহেন্দ্র যখন বললে 'বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম' তখন সত্যানন্দ সে কথার উত্তরে যা বলেছিলেন, নূতন বাংলা তার মধ্যে পথের আলো খুঁজে পেয়েছে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছিলেন—

'সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে বিকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহে—তিনি অনন্তশক্তিময়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম দিলেন তাঁর স্বদেশকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা। নীটশে এক দিন জার্ম্মাণীকে এই শক্তিমন্ত্র শুনিয়ে তার অন্তরে জাগিয়েছিলেন পৌরুষের প্রতি দুর্ব্বার অনুরাগ। খ্রীষ্টের অহিংসার আদর্শকে ভেঙে ফেলে

নীটশে নব্য জার্ম্মানীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শক্তির আদর্শ তাঁর Will to Powerএর বাণী উচ্চারণ ক'রে। সে আদর্শ জার্ম্মাণীকে দিয়েছে ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য। বঙ্কিমও নীট্শের মতই বাঙালীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ক্ষত্রিয়ের পৌরুষের আদর্শ, আর সে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁকেও ভাঙতে হয়েছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুর্ব্বল প্রেমের বিকৃত আদর্শকে। বঙ্কিম বাংলাদেশের কানে শুনিয়েছেন এমন অগ্নি-বচন যা তাকে ক্লৈব্যের গ্রাস থেকে মুক্ত ক'রে অমৃতের পথে পরিচালিত করেছে। বঙ্কিমের প্রতিভার এই দিকটার কথা উল্লেখ ক'রে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন,

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি, তাহা ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র-রক্ষা করেন উহা তাঁহারই মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন নূতন স্বাধীন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি

করবার জন্য অন্যায়ের ধ্বংসের প্রয়োজন আছে। পুরাতনের মৃত্যুর পথে আসে নবজীবনের সমারোহ। সেই পুরাতনকে, সেই অমঙ্গলকে, সেই নিষ্ঠুর অন্যায়কে আর দুর্নীতিকে ভাঙতে গেলে ভগবানের বংশীধারী প্রেমিক রূপের উপাসনা করলে হবে না। বৃন্দাবনের রাধিকামোহন কৃষ্ণ-ঠাকুরটিকে বঙ্কিম তাই আনন্দমঠে স্থান দেন নি। তিনি আবাহন গেয়েছেন সেই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের যিনি শক্তিময়, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে, যিনি সর্ব্বগ্রাসী বন্যায়, যিনি দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, যুদ্ধে আর ভূমিকম্পে, যিনি গড়বার জন্য বজ্র দিয়ে অন্যায়কে ভাঙেন। বঙ্কিম বিবেকানন্দের মতই ভারতবর্ষের কানে দিয়েছেন শৌর্য্যের বাণী। বঙ্কিম বাংলার নীট্‌শে।

স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে আর একটা আদর্শ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সে আদর্শটি হ'ল সাম্যের আদর্শ। স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন, সাম্যেরও তেমনি প্রয়োজন। বঙ্কিম এই সাম্যের আদর্শকেও জয়ী করেছেন তাঁর লেখায়। বঙ্কিম লিখেছেন,

বড়লোকে ছোটলোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড়লোক, যদু ছোটলোক কিসে?······যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং ছোটলোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধনসঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ

করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়া-চোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড়লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোটলোক। অথবা রাম কোনও বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

বঙ্কিম কখনও ধনের আভিজাত্যকে সম্মান দান করেন নি। যাদের টাকা আছে কিন্তু চরিত্র নেই, কর্ম্মদক্ষতা নেই, তাদের প্রতি বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা যে কি সুতীব্র ছিল, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তার অজস্র প্রমাণ আছে। অর্থের প্রাচুর্য্যের মাপকাঠি দিয়ে তিনি যেমন মানুষের মূল্য নির্দ্ধারণ করতেন না, কুলমর্য্যাদাও তেমনি তাঁর কাছে মানুষের মূল্য-বিচারের কষ্টিপাথর ছিল না। বর্ণ-বৈষম্যকে ধন-বৈষম্যের মতই তিনি অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ভারতবর্ষের অবনতির একটী মূল কারণ তিনি দেখেছিলেন বর্ণ-বৈষম্যের মধ্যে। তার পর নারী-পুরুষের যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকেও তিনি সমর্থন করেন নি।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়-সঙ্গত।

এ-কথা বঙ্কিমের কথা। বঙ্কিম যেমন স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, সাম্য-মন্ত্রেরও তেমনি উপাসক ছিলেন। তাঁর "সাম্য" প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে মানুষকে তিনি কতখানি ভাল বাসতেন এবং কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রতি তাঁর কতখানি ঘৃণা ছিল।

বঙ্কিম আজ সুদূরে, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর আরব্ধ সাধনা আজ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর একাকী কণ্ঠের উচ্চারিত বন্দেমাতরম্ আজ সমস্ত ভারতবর্ষের গায়ত্রী মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জন্মভূমিকে মুক্ত দেখবার যে নিবিড় আকাঙ্খা এক দিন তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা আজ অগণিত মনে বাসা নিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের যে স্বপ্ন দেখে কতদিন তাঁর চিত্ত পুলকের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—সেই স্বপ্ন আজ সমস্ত ভারতবাসীর স্বপ্ন। বঙ্কিমের অমরত্ব এইখানেই।

বন্দেমাতরম্

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকটায় রস-চর্চ্চার প্রাধান্য। বিষবৃক্ষে আর দুর্গেশনন্দিনীতে, চন্দ্রশেখরে আর কৃষ্ণকান্তের উইলে, কপালকুণ্ডলায় আর রজনীতে যে বঙ্কিমের পরিচয় পাই আমরা—সে বঙ্কিম আর্টিষ্ট বঙ্কিম। আর্টিষ্ট বঙ্কিম বাঙালীকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেছেন। রসস্রষ্টার আড়ালে আর একজন বঙ্কিমকে আমরা দেখতে পাই—যিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক। এই সমাজসংস্কারক, শিক্ষক বঙ্কিম পরপুরুষের অনুরাগিণী শৈবলিনীকে নরকের বিভীষিকা দেখিয়েছেন, চরিত্রহীনা রোহিণীসুন্দরীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন গোবিন্দলালের হাতে, অভিমানিনী ভ্রমরার সাজানো বাগানখানিকে ভরিয়ে ফেলেছেন আগাছায়, কৃষ্ণকান্তের অপরাধী ভ্রাতুষ্পুত্রকে দগ্ধ করেছেন অনুতাপের তুষানলে, বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিষের বটিকা। রসশিল্পী বঙ্কিম থেকে শিক্ষক বঙ্কিমকে পৃথক ক'রে দেখবার উপায় নেই। প্রতিভার যাদু সৌন্দর্য্যকে করেছে মঙ্গলের বাহন। উপন্যাসের জগতে সৌন্দর্য্যকে সহায় ক'রে কল্যাণের এই জয়যাত্রা নূতন নয়। মনে রাখতে হবে লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ-সৃষ্টি সাহিত্যের একটা বড় কাজ। টলষ্টয় এ্যানা

কেরেনিনা লিখে যা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল আর বিষবৃক্ষ লিখে তাই করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বঙ্কিচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের শেষের দিকটায় কিন্তু রসচর্চ্চার প্রাধান্য অল্পই। আনন্দমঠের বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার বঙ্কিম থেকে স্বতন্ত্র। দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমকে আমরা রাজসিংহের বঙ্কিমের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করতে পারিনে। বিষবৃক্ষের বঙ্কিমচন্দ্র আর কৃষ্ণচরিত্রের বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই এক নয়। বঙ্কিম তাঁর সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বে যে দৃষ্টি নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে হ'চ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম ও সামাজিক কল্যাণের আদর্শ।

এই সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যই বঙ্কিম সৃষ্টি করলেন—গোবিন্দলাল আর রোহিণীকে, প্রতাপ আর শৈবলিনীকে, নগেন্দ্র আর সূর্য্যমুখীকে, আয়েষা আর চন্দ্রশেখরকে। যৌনজীবন উচ্ছৃঙ্খল হ'লে, ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কি সর্ব্বনাশ ঘ'টে থাকে তা দেখানোর জন্যই বঙ্কিম লিখেছিলেন বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইল। চন্দ্রশেখরও এই উদ্দেশ্যেই লেখা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে—অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিমারও পরিবর্ত্তন হয়। সকলের অবশ্য হয় না। বঙ্কিমেরও দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিলো। নূতন দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন তিনি বাস্তবের কদর্য্যমূর্ত্তি। দিকে দিকে অজ্ঞতার অন্ধকার; মানুষ খেতে না পেয়ে বনের শাক-

পাতা খায় ; বস্ত্রের অভাবে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করে। স্বদেশ বঙ্কিমের কাছে দেখা দিলো কালীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে কালীমূর্ত্তি দেখিয়ে বলেছেন,—

"কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পায়ে দলিতেছেন—হায় মা !"

সত্যানন্দের চোখ দিয়ে বঙ্কিম দেখলেন সমস্ত দেশটা শ্মশানের মতো, আর সেই শ্মশানে যারা বিচরণ করে তারা এক একটি জীবন্ত নরকঙ্কাল। এই জীবন্ত নরকঙ্কালগুলির দিকে চেয়ে বঙ্কিমের হৃদয় হায় হায় ক'রে উঠলো। সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, হাস্যময়ী, জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমির এ-কি শীর্ণ-মলিন মূর্ত্তি ! দুর্ভাগা স্বদেশের সকরুণ ছবিখানি তাঁর সমগ্র অন্তরকে অধিকার ক'রে বস্‌লো। আর কোনো চিন্তা নয়। চিন্তার একমাত্র বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো—জন্মভূমির অপরিসীম দুঃখদৈন্য। ব্যাঘ্র যেমন ক'রে তার শিকারকে অনুসরণ করে—তেমনি ক'রে মাতৃভূমির কঙ্কালমূর্ত্তি বঙ্কিমকে অনুসরণ করতে লাগলো।

এই social imagination তীব্র হ'য়ে উঠলে শান্তি থাকে না জীবনে। শান্তি ততক্ষণই—যতক্ষণ বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে থাকি। খেতে বসেছি যখন সবাই মিলে, তখন যদি কেউ প্রত্যেকের আসনের পিছনে দাঁড় করিয়ে

দেয় এক একজন ক্ষুধিত, অস্থিচর্ম্মসার মানুষ—খাওয়ার আনন্দ নিমেষে পণ্ড হ'য়ে যায়, ভোজন ছেড়ে পালাবার আমরা পথ পাইনে। অথচ আমাদের ঘরের দেওয়ালের বাহিরেই দেশের বিরাট শ্মশান প'ড়ে রয়েছে—তার সহস্র সহস্র জীবন্ত নরকঙ্কাল নিয়ে। কয়েক প্রস্থ ইটের পর্দ্দা ভেদ ক'রে আমাদের দৃষ্টি যে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না—তার কারণ আমাদের কল্পনা-শক্তির দৈন্য, আমাদের social imagination-এর অভাব।

বাস্তব যেখানে দুঃখ-বেদনা নিয়ে কল্পনাকে খুব জোরের সঙ্গে নাড়া দেয়, সেখানে হৃদয়বান মানুষের পক্ষে কেবল রসচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকা অসম্ভব। চোখের সামনে ক্ষুধিত মানুষের শীর্ণ মুখচ্ছবি যেখানে অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, সেখানে সাহিত্যিকের কাছে যৌনজীবনের সমস্যাও কখনো একান্তভাবে বড় হ'য়ে দেখা দেয় না। উদরে যেখানে অন্ন নেই, দেহ যেখানে অর্দ্ধউলঙ্গ—সেখানকার সমস্যা তো ঈশ্বরকে জানা না-জানার সমস্যা নয়, ইন্দ্রিয়-জয়েরও সমস্যা নয়; সেখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'লো মানুষকে বাঁচানোর সমস্যা। বাঁচলে তবে তো মানুষ ধর্ম্ম করবে, বেদান্ত পড়বে, সৌন্দর্য্য-সাধনায় ব্রতী হবে এবং নৈতিক জীবনকে উন্নত ক'রে তুলবার অবসর পাবে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা কত খ্যাতনামা সাহিত্যিক জীবনের পুষ্প-বিছানো পথে চলতে চলতে সহসা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে বাস্তবের নিষ্ঠুর শ্মশানকে, কানে শুনেছে নিখিলের হাহাকার। সেই শ্মশানের সামনে মর্ম্মের গভীরতম

প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি মাত্র ছুর্ব্বার প্রশ্ন What Then Must We Do? আর্টিষ্টকে পিছনে রেখে এগিয়ে এসেছে ফিলজফার। রসশিল্পী তার বাঁশি নামিয়ে রেখে তুলে নিয়েছে পাঞ্চজন্য। সৌন্দর্য্যের পূজারীর হাতে ছুলে উঠেছে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা। আইডিয়ায় প্রাধান্যের কাছে আর্ট মেনেছে পরাজয়। রসশিল্পীর সাহিত্য-জীবনে স্থুরু হয়েছে নূতন অধ্যায়।

প্রথম শ্রেণীর বহু শিল্পীর সাহিত্য-সাধনার ধারা রসচর্চ্চার খাতকে বর্জ্জন ক'রে সহসা নূতন খাতে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে—বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে প্রচুর। একটি বড় নজির হচ্ছে—টলষ্টয়ের সাহিত্য-জীবন। তাঁর War and Peaceএর মত উপন্যাস সাহিত্যে বিরল আর এই উপন্যাসখানিতে রসেরই প্রাচুর্য্য। কিন্তু অতুলনীয় উপন্যাস দিয়ে স্থুরু হোলো যাঁর শিল্প-সাধনা—তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে তিনি সমাপ্ত করলেন What Then Must We Do? এর মত বই লিখে—যার মধ্যে রসকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তত্ত্ব। বাস্তবের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা ইউরোপের অতুলনীয় ঔপন্যাসিককে রসচর্চ্চার পথ থেকে টেনে নিয়ে এল আইডিয়া প্রচারের ক্ষেত্রে। মস্কো শহরের অপরিসীম দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে স্থুগভীর পরিচয় টলষ্টয়ের চিত্তে আনলো বিপ্লব—তাঁর মনের আকাশকে কালো করে তুললো বিষাদের পুঞ্জীভূত মেঘে। কি ক'রে মানুষকে মানুষের মতো ক'রে

বাঁচানো যায়—এই সমস্যা টলষ্টয়ের জীবনে দাঁড়ালো প্রধান সমস্যা হ'য়ে। আর্টিষ্ট ধীরে ধীরে বিদায় নিলো, মানব-প্রেমিকের অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে আমরা শুনতে পেলাম প্রতিবাদের সুর—প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর, আমরা চলতি ভাষায় যাকে দয়া বলি, উপচিকীর্ষা বলি—তারই কপটতার ও অসারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর। টলষ্টয়ের বেলায় দৃষ্টি-ভঙ্গিমার যে পরিবর্ত্তন দেখলাম, রাস্কিনের বেলাতেও তাই। সাহিত্য-জীবনের আদিতে রাস্কিন সৌন্দর্য্য-সাধনায় ব্রতী, আর্টের তিনি একজন প্রথিতযশা সমঝদার। পরবর্ত্তী যুগের রাস্কিন স্বতন্ত্র মানুষ। মানুষের দুঃখ-দৈন্য তাঁর অন্তরে এনেছে বিপ্লব আর তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে সাম্যের জয়ধ্বনি। টলষ্টয় যেমন তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিয়েছেন What Then Must We Do ? নামক পুস্তকে, Unto This Lastও তেমনি রাস্কিনের অভিজ্ঞতাকে করেছে প্রকাশ। যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে টলষ্টয়ের সাহিত্য-জীবনে, রাস্কিনের সাহিত্য-জীবনে—সেই পরিবর্ত্তনকেই আমরা দেখতে পাই আনাতোল ফ্রাঁসের আর রোমা র‍ঁল্যার, অলডাস হাক্সলির আর বার্ণার্ড শ'য়ের সাহিত্য-সাধনায়। রলাঁ্যার জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যে রসের আধিক্য। তাঁর Soul Enchantedএর প্রথম তিন খণ্ডের মধ্যেও আর্টই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু শেষ তিন খণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ 'The Death Of The World,' 'The Combat' এবং 'Via Sacra'তে রসের প্রাধান্যের চেয়ে বেশী ক'রে প্রকাশ পেয়েছে

আইডিয়ার প্রাধান্য। রসশিল্পী রল্যাঁর হাতে তুলে উঠেছে যোদ্ধার জয়ধ্বজা—ফ্যাসিজ্‌মের অত্যাচারের আর অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন সংগ্রাম। অলডাস্‌ হাক্সলির Ends and Means রসশিল্পীর জীবনে এই পরিবর্ত্তনেরই সূচনা করে। তিনি শিল্পীকে পিছনে রেখে Ends and Meansএ দেখা দিয়েছেন—বিংশশতাব্দীর বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে। ইউরোপের দেশে দেশে যখন তরবারির ঝঞ্চনা আর সৈনিকের কুচকাওয়াজ, উড়োজাহাজের বোমায় আর কামানের গোলায় যখন সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটতে বসেছে—তখন তো রসচর্চ্চার সময় নয়। তখন সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে অভিযান করবার সময়।

জীবনের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে আনে বিপ্লব। এই মানসিক বিপ্লব প্রকাশ পায় সাহিত্যে। দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে যখন পরিবর্ত্তন আসে—সাহিত্য-সাধনার ধারাও তখন নূতন পথে প্রবাহিত হয়। একথা যেমন টলষ্টয়ের আর রোমা রল্যাঁর, রাস্কিনের আর হাক্সলির বেলাতে সত্য—বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাতেও তেমনি সত্য। আগেই বলেছি, বঙ্কিমের জীবনে এমন একটা দিন এলো—যখন তাঁর মাতৃভূমির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা একান্ত সত্য হয়ে দেখা দিলো তাঁর কাছে। অহরহ তাঁর মনের মধ্যে জাগতে লাগলো হৃতসর্ব্বস্ব, ধূল্যবলুণ্ঠিত স্বদেশের অশ্রুসজল ম্লানমূর্ত্তি। মস্কোর দুর্ভাগা নরনারীর

দুর্ব্বহ দুঃখদৈন্যের ছবি টলষ্টয়ের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়েছিল, What Then Must We Do? এই একই প্রশ্ন বঙ্কিমের মনেও জেগে উঠলো ভারতবর্ষের দুরবস্থা দেখে। কি করা যায়? কেমন করে জন্মভূমির ম্লানমুখে ফিরিয়ে আনা যায় তৃপ্তির হাসি? কেমন ক'রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ঐশ্বর্য্যের শিখর-দেশে? তার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরক্ষর মানুষগুলিকে কেমন ক'রে আবার বাঁচানো যাবে মনুষ্যত্বের মহিমার মধ্যে? নগেন্দ্রের মতো, গোবিন্দলালের মতো, শৈবলিনীর মতো যে সব দুর্ভাগা নরনারী আত্মসংযমের আদর্শকে ভুলে গিয়ে দুর্নীতির পঙ্কিল পথে পা বাড়িয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতির ছবি এঁকে জাতির চিত্তে সংযমের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন আছে স্বদেশের নিরন্ন মানুষগুলিকে বাঁচাবার। চোখের সামনে অন্নাভাবে তারা যে তিলে তিলে মরে যায়! নীতির প্রশ্ন বড়, কিন্তু তার চাইতেও বড় প্রশ্ন হচ্ছে বাঁচার প্রশ্ন। গোবিন্দলালের পাপে ভ্রমরের সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়—এ দৃশ্য দুঃসহ, কিন্তু আরও দুঃসহ হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামের কোটী কোটী চলন্ত নরকঙ্কালের ছবি। নগেন্দ্রের দুর্নীতির ফলে সূর্য্যমুখীর সোনার সংসার রসাতলে যেতে বসেছে—এ চিত্র মর্ম্মন্তুদ, কিন্তু আরও মর্ম্মন্তুদ হ'চ্ছে মাতৃকোলে রোরুদ্যমান ক্ষুধাতুর শিশুদের ক্রন্দন-ধ্বনি। শৈবলিনীর অপরাধে চন্দ্রশেখরের

দাম্পত্য জীবন যেখানে অভিশপ্ত, সেখানে আমরা দুঃখ পাই; আরও দুঃখ পাই যখন দেখি, অজ্ঞতার আর ভীরুতার অভিশাপ কোটী কোটী মানুষের চিত্তকে রেখেছে পঙ্গু ক'রে।

উপন্যাসে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-জয়ের আদর্শকে জয়ী ক'রে বঙ্কিমের চিত্ত আর তৃপ্তি খুঁজে পেলো না। নতুন আদর্শ তাঁর হৃদয়কে অধিকার ক'রে বসলো—জন্মভূমিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার আদর্শ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়তে হবে—যে ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত, জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, শৌর্য্যে অপরাজেয়! ভাবী ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে কল্পনা ক'রে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে সত্যানন্দ মহেন্দ্রসিংহকে বলছেন,

"দশভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, এসো আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

নূতন ভারতবর্ষের এমন অনবদ্য আদর্শ আর কি কারও লেখায় ফুটে উঠেছে এত জীবন্ত হ'য়ে? বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ভারতবর্ষে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে। সেখানে প্রত্যেকটি গৃহে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য—প্রত্যেকটি মানুষের মন সংস্কৃতির শুভ্র আলোকে দেদীপ্যমান। সেখানে দারিদ্র্য নেই, সেখানে অজ্ঞতা নেই। জাতিকে গৌরবের উচ্চ শিখরে বেঁচে থাকতে হ'লে সম্পদ এবং সংস্কৃতি ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন; মানুষগুলিকে শক্তিমান হ'তে হবে। যারা দুর্ব্বল, তারা

আত্মরক্ষায় অক্ষম। এই জন্যই বঙ্কিম লক্ষ্মী-সরস্বতীর পাশে বলরূপী কার্ত্তিকেয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমের ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল যে স্বদেশ—সেখানে মানুষ একদিকে যেমন দারিদ্র্য থেকে মুক্ত, আর একদিকে তেমনি ভয় থেকে মুক্ত; একদিকে তারা যেমন সংস্কৃতির অধিকারী, আর একদিকে তেমনি তারা পৌরুষের গরিমায় দৃপ্ত। মরতে যারা ভয় পায়, তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে কেমন ক'রে?

"এই মা যা হইবেন। দশভূজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রয়ী বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

এ কান্না সত্যানন্দের কান্না না বঙ্কিমের কান্না? ভাবী ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিকে ধ্যান ক'রে পুলকের আতিশয্যে বঙ্কিমের নয়নযুগল কতদিন অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে! কতরাত্রির নীরব অন্ধকারে নিঃশব্দে তিনি কেঁদেছেন স্বদেশের সেই রূপকে কল্পনা ক'রে যেখানে মানুষগুলি খেতে পাচ্ছে দু'বেলা পেট ভ'রে, যেখানে তাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত এবং পৌরুষ অম্লান।

কিন্তু কেমন ক'রে জন্মভূমির এই জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করা যায়? বঙ্কিম বললেন—তার জন্য প্রথম চাই দেশাত্মবোধের জাগরণ। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে

হবে জন্মভূমির প্রতিমাকে—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

মহেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা'র এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "যবে মা'র সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে।"

আমাদের চেতনায় জন্মভূমি তো কখনো জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় নি! মাতৃভূমিকে আমরা কখনো তেমন ক'রে মা ব'লে ডাকিনি। ইংরেজ বৃটিশ ব'লে আপনার পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করে; জাপানের লোকে আপনার পরিচয় দেবার সময় সর্ব্বাগ্রে বলে—আমি জাপানী, ফ্রান্সের লোকে বলে—আমি ফরাসী, জার্ম্মানীর লোকে বলে—আমি জার্ম্মান। আমরা তো নিজেদের পরিচয় দেবার সময় কখনো বলিনি, আমি ভারতবাসী। আমরা পরিচয় দিয়েছি হিন্দু ব'লে, মুসলমান ব'লে, শাক্ত ব'লে, বৈষ্ণব ব'লে। আমরা এতদিন চিনে এসেছি আমাদের মাকে, আমাদের বাপকে, আমাদের ভাইকে, আমাদের স্ত্রীকে, আমাদের পুত্রকে, আমাদের কন্যাকে। আমাদের কাছে এতদিন একান্ত সত্য হ'য়ে ছিলো—আমাদের ঘর আর খামার, আমবাগান আর পুষ্করিণী, শিব-দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী আর কাশী-গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান। এক-জাতীয়ত্ব-বোধ আমাদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। জাতি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমাদের হৃদয়কে কখনো অধিকার করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

'ভারত কলঙ্ক' নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন,

"যে সকল অমূল্যরত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জাতি জানিত না।"

ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের দর্শন অধ্যয়ন ক'রে বঙ্কিম দুটি রত্ন সংগ্রহ করলেন—স্বাধীনতার প্রতি দুর্নিবার অনুরাগ আর জাতি-প্রতিষ্ঠার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। বঙ্কিম ভারতবাসীকে এ দুটি রত্ন উপহার দিয়ে মুক্তিপাগল নূতন ভারতবর্ষের গুরুর স্থান অধিকার করলেন। একথা তিনি পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন, স্বদেশকে নতুন করে গড়বার পথে সব চেয়ে প্রবল অন্তরায় রাজনৈতিক পরাধীনতা। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে না পারলে তাঁর ধ্যানের জন্মভূমি বাস্তবের মধ্যে কখনো সত্য হয়ে জেগে উঠবে না। আর একটি সত্য ধরা দিয়েছিলো তাঁর নির্ম্মল ঋষি-দৃষ্টিতে। এই দ্বিতীয় সত্যটি হ'লো ঐক্য। সবাইকে এক করতে না পারলে স্বাধীনতা নাগালের বাইরে থেকে যাবে। ছোট ছোট গণ্ডীগুলিকে ভেঙে দিতে হবে—পারিবারিক গণ্ডী, সাম্প্রদায়িক গণ্ডী, প্রাদেশিক গণ্ডী। মানুষের সঙ্গে মানুষকে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়কে, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশকে মেলাতে হবে। মিলবে তখনই—যখন সব সন্তান মাকে মা ব'লে ডাকবে, সবাই সবাইকে চিনবে

একই দেশের মানুষ ব'লে। এই দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বঙ্কিমই অগ্রদূত। তাঁরই দেওয়া 'বন্দেমাতরম্'কে আশ্রয় ক'রে শতধাবিচ্ছিন্ন দেশ ঐক্যের সাধনায় ব্রতী হোলো, তাঁরই লিখিত আনন্দমঠ প'ড়ে তরুণ ভারতবর্ষের চিত্তে জাগলো —জাতি-প্রতিষ্ঠার অদম্য সংকল্প। ভবানন্দের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে যে বাণী তিনি দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিলেন, তাই অবশেষে রূপকথার সোনার কাঠির মত সহস্র সহস্র মহেন্দ্র সিংহের ঘুমন্ত মনে আনলো জাগরণের সাড়া। ভবানন্দ বললেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—"। এই বাণী থেকেই সৃষ্টি হোলো নূতন ভারতবর্ষ—সুরেন্দ্রনাথের আর বিপিন পালের, অরবিন্দের আর রবীন্দ্রনাথের, তিলকের আর গোখেলের, দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহেরুর, গান্ধীর আর লালা লাজপত রায়ের, জওহরলালের আর সুভাষচন্দ্রের মুক্তিপাগল নবীন ভারতবর্ষ। বঙ্কিম স্বদেশের বেদীমূলে কেবল যে জীবন দান করতে শেখালেন, তা নয়। জীবন তুচ্ছ—সকলেই ত্যাগ করতে পারে। বঙ্কিম শোনালেন ভক্তির অর্থাৎ জন্মভূমির পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে উজার ক'রে দেবার মহামন্ত্র।

স্বাধীনতার জন্য এই দেশাত্মবোধ হোলো গোড়ার কথা।

মুক্তিলাভের রহস্য হোলো প্রেমের মধ্যে। একজনের পিছনে যেখানে সহস্র জন এসে দাঁড়ায়, সেখানে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে—এমন সাধ্য আছে কার? একজনের প্রতি আর একজনের প্রেমকে জাগানোর জন্য ঐক্যের অনুভূতির প্রয়োজন আছে। জাতিপ্রতিষ্ঠা বিরাট ঐক্যের অনুভূতিকে জাগানোর পক্ষে অপরিহার্য্য। 'বন্দেমাতরম'—এই মৃত্যুহীন মহামন্ত্র জাতির কর্ণে বঙ্কিম বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করলেন জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্য।

স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেমের সঙ্গে আর একটি গুণের প্রয়োজন আছে—আর এই গুণটি হোলো নির্ভীকতা। অত্যাচারীর ঔদ্ধত্য কোটি কোটি মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে—এ হোলো সত্যের একটা দিক মাত্র। সত্যের আর একদিকে র'য়েছে জনসাধারণের দাসসুলভ মনোবৃত্তি। অত্যাচারকে বাঁচিয়ে রেখেছে—যারা নিপীড়িত তাদেরই ধৈর্য্য, তাদেরই ক্লৈব্য, তাদেরই 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'। হাক্সলির ভাষায়,

Tyranny cannot exist unless there is passive obedience on the part of the tyrannised.

যারা নিপীড়িত—তারা অন্যায়কে মেনে না নিলে অত্যাচার কখনো টিঁকে থাকতে পারে না। এই যে বংশপরম্পরায় অত্যাচারকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বেঁচে থাকবার মত ধৈর্য্য—

যাকে শত দুঃখ শত লাঞ্ছনা বিচলিত করতে পারে না—জনসাধারণের এই ধৈর্য্যের মতো অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ইতিহাসে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। হাক্সলির ভাষা পুনরায় উদ্ধৃত ক'রে বলি,

The patience of common humanity is the most important and almost the most surprising fact in history. Most men and women are prepared to tolerate the intolerable.

ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আর আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে যারা সাধারণ মানুষ তাদের ধৈর্য্য। যা অসহ্য—তাকে সহ্য করতে অধিকাংশ নরনারীর মনেই কোনো কুণ্ঠার উদ্রেক হয় না। এই সর্ব্বনেশে ধৈর্য্যের প্রতি কটাক্ষ ক'রে ভবানন্দ বলেছেন মহেন্দ্রসিংহকে,

"মহেন্দ্রসিংহ! তোমাকে মানুষের মতো মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা; কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো দেখি না। সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না?"

ভবানন্দের কণ্ঠ থেকে এই যে ভর্ৎসনার বাণী উৎসারিত হয়েছে—এ বাণী হোলো নবীন ভারতবর্ষের কানে বঙ্কিমের বাণী। বঙ্কিম চাইলেন—কবরের নির্জ্জীব শান্তিকে ভেঙে দিয়ে ভারতবর্ষকে মুক্তির জন্য অধীর করে তুলতে—ভারতবাসীকে অশান্ত

করতে, তুরন্ত করতে, তার মনের মধ্যে অসন্তোষের দাবানলকে ধূ ধূ ক'রে জ্বালিয়ে দিতে।

এই যে ধৈর্য্য—এর মূলে কি? এর মূলে ভীরুতা। লক্ষ লক্ষ মানুষ মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিদিন অনুভব করে, জীবন তুর্ব্বহ; কিন্তু তবুও যে তারা তুর্ব্বহ জীবনের গ্লানিকে দিনে দিনে বহন করে চলেছে—তার কারণ রাজভয়, মৃত্যুভয়, আরও অনেক রকমের ভয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালে নির্য্যাতন সইতে হবে অনেক—এই ভয়েই মানুষ চরম তুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও অবিচলিত থাকে। এই ভীরুতা আমাদের মুক্তিলাভের পথে যে একটি প্রকাণ্ড অন্তরায়—একথা বঙ্কিম বেশ ভালো ক'রেই জানতেন আর সেইজন্যই তিনি ভবানন্দের মুখ দিয়ে আনন্দমঠে বলেছেন,

"ধর, এক—ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়। ধর, তারপর ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহী মাহিয়ানা পায় না! তারপর শেষ কথা সাহস। কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে তুশ'জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলেও একটা ইংরেজ পলায় না।

মহেন্দ্রসিংহ যখন ভবানন্দকে বল্‌লেন, 'তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোনদিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি'—ভবানন্দ উত্তর দিলেন, 'অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও

দেখিলাম।' মহেন্দ্র পুনরায় যখন বললেন, 'ভালো করে দেখনি, একদিন দেখিবে'—ভবানন্দের কণ্ঠ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো, 'না হয় দেখলাম, একবার বই তো দুবার মরব না।'

বঙ্কিমের কণ্ঠে এই মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। তিনি জানতেন, আবেদনের আর নিবেদনের পথে স্বাধীনতা কোনোদিনই আসবে না। বঙ্কিমের কল্পনায় জন্মভূমির যে অপরূপ মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিলো—তাঁর হাতে ভিখারিণীর ভিক্ষাপাত্র নয়—তাঁর দশহস্তে দশ প্রহরণ। তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না কাকুতি-মিনতিতে। চোখের জলে বিচলিত হয়ে শাসকেরা এক দিন তাদের শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করবে—বঙ্কিমের মনে এমন ভ্রান্তধারণা কোনদিনই বাসা বাঁধতে পারেনি। তাঁর বুদ্ধি ছিলো ক্ষুরধার এবং দৃষ্টি ছিলো অন্তর্ভেদী। মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন ছিল সুপ্রচুর, ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিলো তেমনি সুগভীর। শক্তির ঔদ্ধত্যকে কাবু করতে হ'লে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নেই—এই সত্য সহজেই তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিলো। এই জন্যই প্রবন্ধে, উপন্যাসে, ব্যঙ্গ-রচনায় বারম্বার তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন—ভিক্ষাপাত্র বহনের নিস্ফলতা। 'জয়রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো'—ক্লীবের এই পলিটিক্সের প্রতি তাঁর অন্তরে ছিলো একটা বিজাতীয় ঘৃণা। কতবড় ঘৃণা ছিলো—সে কথা বোঝা যায় তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের 'পলিটিক্স্' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে। এই প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিম বল্ছেন—

"দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম। এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশ্যন। আর উলসী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেক এই কুকুরদলের পলিটিশ্যন।"

বঙ্কিম বিশ্বাস কর্‌তেন বৃষজাতীয় পলিটিক্‌সে। তিনি বিশ্বাস কর্‌তেন, পৌরুষে, নির্ভীকতায়, শক্তিতে, মুক্তির জন্য মৃত্যু-বরণের পাগলামিতে। কুক্কুর-জাতীয় রায় বাহাদুরী, খাঁ বাহাদুরী পলিটিক্‌সের উপরে তাঁর আদৌ কোনো আস্থা ছিলো না। কমলাকান্তের দপ্তরে 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে ভ্রমরের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বঙ্কিম বলেছেন—

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান ঘ্যান করি না। মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জানো মধু সংগ্রহ করিতে, না জানো হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিতে পারো। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্র ঘ্যান ঘ্যান।"

মডারেট মেণ্টালিটির মেরুদণ্ডহীন পলিটিসিয়ানদের ঘ্যান-ঘ্যানে রাজনীতি-চর্চ্চাকে কাঁদুনে মেয়ের কান্নার মতোই তিনি অতিশয় কৃপার চক্ষে দেখতেন। তিনি এসেছিলেন আমাদিগকে ক্ষাত্রবীর্য্যে গর্ব্বিত ক'রে তুলতে। হুল ফোটাতে না পারলে মধু সংগ্রহ অসম্ভব—এই কথা শেখাবার জন্য এসেছিলেন বঙ্কিম। তাঁর কণ্ঠে শক্তির মন্ত্র, তাঁর রসনায় অত্যাচারকে আঘাত করবার

বাণী। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সবটুকুই ছিলো ক্ষত্রিয়ের ধাতুতে গড়া। বিধাতা তাঁকে 'ধর্ম্মপুত্তুর' যুধিষ্ঠির ক'রে পাঠাননি, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ক'রে পাঠিয়েছিলেন। এই জন্যই তো বঙ্কিম সাহিত্যে কেবল ভালো মানুষের ছবি এঁকে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। চারিদিকে যেখানে স্বার্থোদ্ধত অবিচারের আধিপত্য চলেছে—সেখানে ভালোমানুষীর কোন অর্থ হয় না। ব্যভিচারই মানুষের চরিত্রের একমাত্র দুর্ব্বলতা নয়। এমন মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে—যারা যৌনজীবনে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করা প্রয়োজন বোধ করে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম স্বরও যাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় না। বলাবাহুল্য, এরা ভালো মানুষ হ'তে পারেন কিন্তু এদের ভালো-মানুষীর মধ্যে নেই বুদ্ধির দীপ্তি। এঁরা সাধু কিন্তু বোকা-সাধু। এদের হুল ফোটাবার মতো না আছে বুদ্ধি, না আছে সাহস। বঙ্কিম জানতেন, তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্য জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু যারা কেবলই সাধু অর্থাৎ বোকা-সাধু—তারা একাজের উপযুক্ত নয়। এমন মানুষ চাই—জাতিকে নতুন করে তৈরী করবার জন্য যারা একদিকে যেমন অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় হবে আর একদিকে তেমনি পাপকে ঠেকাবার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, জীবন পণ ক'রে অন্যায়কে বাধা দেবে, প্রাণ থাকতে অত্যাচারকে কখনো স্বীকার ক'রে নেবে না।

এই শৌর্য্যের আদর্শকে জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তিনি লিখলেন—রাজসিংহ আর দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ আর কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

"যে ধর্ম্ম-রক্ষায় ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম।"

অন্যায় যে করে আর আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

রবীন্দ্রনাথের এই দুই লাইনের সঙ্গে বঙ্কিমের কথার মিল আছে।

পাপ কাকে বলে, অধর্ম্ম কাকে বলে—বঙ্কিম তার পরিষ্কার সংজ্ঞা দিয়েছেন উপরের কয়েকটি লাইনে। মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে তিনি পাপ ব'লে বিবেচনা করতেন। সেই পাপকে ঠেকাবার চেষ্টায় যারা উদাসীন—বঙ্কিমের কাছে তারা অধার্ম্মিক। তুমি দুঃস্থ পাড়া-প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারো, তুমি পরস্ত্রীর মুখদর্শন না করতে পারো, তুমি বহু তীর্থে পর্য্যটন করতে পারো, তুমি তৃণের মত নম্র এবং তরুর মত সহিষ্ণুও হ'তে পারো, তুমি মদ্যপান এবং পরদ্রব্য অপহরণ না করতে পারো—কিন্তু দুর্নীতিকে, অন্যায়কে, অত্যাচারকে উন্মূলিত করবার জন্য তুমি যদি বদ্ধপরিকর না হও—বঙ্কিমের মতে তুমি অধার্ম্মিক, পাপী, ভগবানের এবং

মানুষের দরবারে অপরাধী। কৃষ্ণচরিত্র লেখা হয়েছিলো অন্যায়কে প্রাণপণে বাধা দেবার আদর্শকে জাতীয় জীবনে জয়যুক্ত করবার জন্য।

মহাভারতের কৃষ্ণ ভারতবর্ষের আদর্শ মনুষ্য। এই আদর্শ মনুষ্য খৃষ্টীয় আদর্শ-পুরুষের মতো বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী সন্ন্যাসী নন্। ইহুদীরা রোমকের অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করতো এবং খৃষ্টকে করতো তাদের সেনাপতি — 'কাইজারের পাওনা কাইজারকে দাও' ব'লে তিনি প্রস্থান করতেন। ভারতবর্ষের কৃষ্ণ মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে আদৌ কুণ্ঠা অনুভব করেননি। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নত-শির অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধরিয়েছেন তিনি, তাকে প্রণোদিত করেছেন শত্রু-নিধনে। হাতে তাঁর পাঞ্চজন্য; দুষ্টের দমনে তাঁর উল্লাস। তিনি কেবল সৃষ্টি করেন না, কেবল পালন করেন না, ধ্বংসও করেন। তিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন। এই কৃষ্ণেরই পূজারী আনন্দমঠের সন্তানেরা। এই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা অনন্তশক্তিময় বিষ্ণুই ছিলেন বঙ্কিমের উপাস্য বিষ্ণু আর এই বিষ্ণুকেই তিনি করতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীর ইষ্টদেবতা। কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য-বাজানো এই কৃষ্ণের চরিত্রকে অবনত

ক'রে যে দিন থেকে ভারতবর্ষ বৃন্দাবনের মুরলী-বাজানো কৃষ্ণের অনুকরণে ব্যস্ত হয়েছে—সেদিন থেকেই যে তার সর্ব্বনাশ সুরু হয়েছে—বঙ্কিমের অসামান্য প্রতিভার কাছে এই সত্য অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছিলো। কৃষ্ণচরিত্রের এক জায়গায় বঙ্কিম লিখেছেন,

"যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল, যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত —মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহই স্মরণ করে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র সত্য-সত্যই ঋষি ছিলেন। জাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য যত দিক দিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে, সব দিকের কথাই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা ক'রে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জাতি-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব, এই জন্যই তিনি জাতির কর্ণে উচ্চারণ করলেন বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন ভারতবর্ষকে গড়বার জন্য নতুন মানুষের দরকার—যারা হবে অনাসক্ত, যারা ঘরের মোহ থেকে হবে মুক্ত, ইন্দ্রিয়-লালসায় পঙ্গু হবে না যাদের উদ্যম এবং আদর্শনিষ্ঠা, ধন-লোভে যাদের চিত্ত হবে না চঞ্চল, রাজভয়ে, মৃত্যুভয়ে যাদের পৌরুষ হবে না ম্লান। আনন্দমঠের সন্তানেরা এই আদর্শেরই প্রতীক। আর একটা কথা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সাধু-সন্ন্যাসী আর

বৈষ্ণবের দেশে শান্তশিষ্ট মানুষগুলিকে করে তুলতে হবে এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ভোঁতা ভালমানুষ দিয়ে হাসপাতালে সেবাশুশ্রূষার কাজ চলতে পারে, মুষ্টিভিক্ষা আদায় হতে পারে, কালাজ্বর নিবারণের জন্য কেন্দ্র খোলা যেতে পারে, তাদের দিয়ে হবে না কেবল স্বাধীনতা-অর্জ্জনের কাজ। তার জন্য এমন একদল সিংহসদৃশ মানুষ চাই যারা অন্যায় আর অত্যাচারকে নিমেষের জন্যও সহ্য করবে না। কিন্তু যে দেশে ভগবান কেবল বাঁশি বাজান, কুঞ্জে কুঞ্জে অভিসার করেন আর বনফুলের মালা প'রে রাধার মন ভোলাবার জন্য কদমতলায় বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন—সে দেশে মানুষ কেমন ক'রে পৌরুষের গরিমায় প্রচণ্ড-মনোহর হ'য়ে উঠবে? জয়দেব গোঁসাইয়ের রাধিকামোহন কান্তকোমল কৃষ্ণ যেখানে মানুষের ইষ্টদেবতা—সেখানে তৃণের মত সুনীচ এবং তরুর মত সহিষ্ণু হওয়াই যে ভক্তের আদর্শ হয়ে উঠবে—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আদর্শই তো মানুষের চরিত্রকে গ'ড়ে তোলে। ভগবানকে এদেশে যে আদর্শে তৈরী করা হয়েছে—মানুষও সেই আদর্শে গ'ড়ে উঠেছে। আদর্শের অবনতি মানুষকে অবনত করে। বঙ্কিম তাঁর স্বদেশবাসীকে তৃণের মত সুনীচ আর তরুর মত সহিষ্ণু ক'রে গড়ে তুলতে চান নি। তিনি তাদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন আহত সিংহের অশান্ত রূপ, পদাহত কালভুজঙ্গের দৃপ্ত ফণার বিস্তার, শৌর্য্যের এবং শক্তির ভীষণ-মধুর প্রকাশ। এই জন্যই জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে যে কৃষ্ণকে তিনি প্রতিষ্ঠিত

করতে চাইলেন নবীন ভারতের হৃদয়-সিংহাসনে—সে কৃষ্ণ মহাভারতের পাঞ্চজন্য-বাজানো কৃষ্ণ যিনি মৃত্যুকে ডেকে আনেন নবজীবনের আবির্ভাবের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য—যিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের আর মহামারীর মধ্যে, দুর্ভিক্ষের আর মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে, বন্যার আর ভূমিকম্পের মধ্যে, যাঁর বাঁশি বাজে বজ্রে।

বঙ্কিম সত্য সত্যই ঋষি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এতবড় মানুষ ভারতবর্ষে আর জন্মায়নি। তিনি যে এই নূতন ভারতবর্ষের স্রষ্টা—এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম। *

বন্দে মাতরম্

ব্রাহ্মণবেড়িয়া বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	সাম্যবাদের গোড়ার কথা	১।০
২।	মনের খেলা	১৲
৩।	রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ	১৲
৪।	অগ্রদূত	১৲
৫।	মনের গভীরে	১৲
৬।	কমিউনিজ্‌ম্‌	৸০
৭।	রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র	৸০
৮।	স্বর্গের ঠিকানা	৸০
৯।	মরুজয়ের সেনা	॥০
১০।	সব-হারাদের গান	॥০
১১।	সাম্যবাদের মর্ম্মকথা	॥০
১২।	ঘরের মায়া	৶০
১৩।	সেনাপতি গান্ধী	।৵০
১৪।	রাশিয়ার কথা	।০
১৫।	মানুষের অধিকার	।০
১৬।	ত্রয়ী	।০
১৭।	অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ	৵০
১৮।	বঙ্কিমের স্বপ্ন	৵০
১৯।	সভ্যতার ব্যাধি	৵০
২০।	চারণ-গীতি	৵০
২১।	বিদ্রোহীর স্বপ্ন (যন্ত্রস্থ)	৸০